বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

নভেম্বর | ২০২৬



বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩৩তম বর্ষ ■ ১১ম সংখ্যা

নভেম্বর ২০২৬♦ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩৩♦ জমা.আউ.-জমা. সানী ১৪৪৮

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান
মুহাম্মদ জামান আহমদ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
জাহিদ রাহি

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

প্রবন্ধ
ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ফিকহী বিচক্ষণতা/আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা ০৬
শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার দরসগাহ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
বাংলার মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তন/জুলফিকার মুরতাজা ০৯
দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা জানানোর শরঈ বিধান/ইব্রাহিম আরিফ ১২
জঙ্গে জামাল : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি/জুনাইদ আহমদ মাশহুর ১৫

ফিকহ
ফরয গোসলের মাসাইল/ড. মো. মুহিবুর রহমান ১৯

সাক্ষাৎকার
কবি আবদুল মুকীত চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ২২

আন্তর্জাতিক
মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির সমীকরণ : কূটনীতি, নির্বাচন ও সম্ভাব্য যুদ্ধ/মুহাম্মাদ বিন নূর ২৪

ধারাবাহিক
বিদআত : ধারণা ও বিশ্লেষণ/মো. জিয়াউর রহমান ৩০

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৩
খাতুন ৩৪
বিজ্ঞান ৩৬
এক নজরে গতমাস ৩৭
আবাবীল ফৌজ ৪০
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

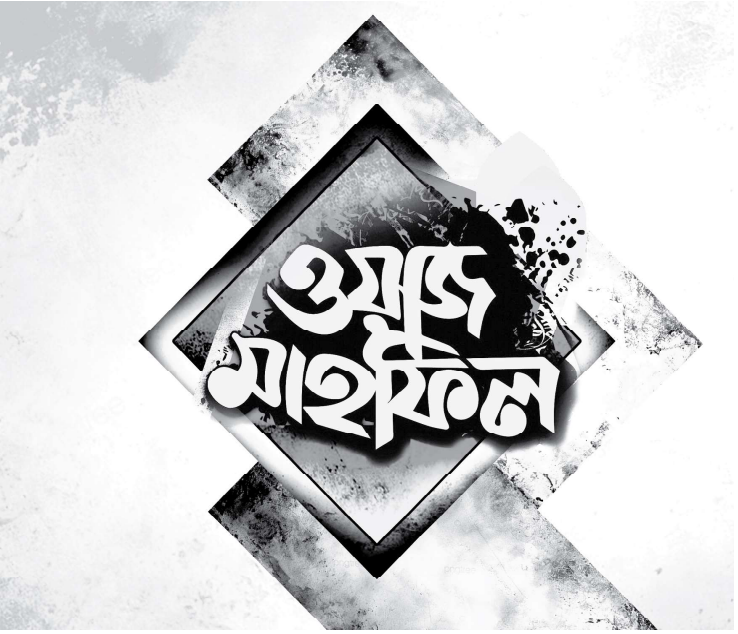

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

ওয়াজ-মাহফিল উপমহাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বছরের প্রায় পুরোটা সময়ই কোথাও না কোথাও ওয়াজ-মাহফিল, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তবে শীতকালীন মৌসুমে এর আয়োজন ও ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, যুবসমাজ ও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চল থেকে শহর সর্বত্রই ধর্মপ্রাণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এসব মাহফিল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই আয়োজনগুলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। তাই এই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একে আরও সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।

ওয়াজ-মাহফিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বক্তা নির্বাচনের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসকল মাহফিলে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, নেককার, আদর্শবান ও দায়িত্বশীল আলিমদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত, যারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম। যাদের বক্তব্যের ভাষায় থাকবে শালীনতা, জ্ঞানের গভীরতা এবং উপস্থাপনায় থাকবে হিকমত ও প্রজ্ঞা। যারা মানুষের অন্তরে খুদাভীতি, রাসূলপ্রেম, সাহাবায়ে কিরামের অতুলনীয় আদর্শ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম। বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করাই থাকবে তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে—কোনো কোনো সময় এরকম বরকতময় মাহফিলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন চটকদার বক্তব্য, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, হাসি-তামাশা, অতিরঞ্জনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এমনকি শিরকী কথাবার্তাযুক্ত বাউলসুলভ পরিবেশনাও শোনা যায়। আয়োজকদের উচিত সচেতনতা অবলম্বন করা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে এসব বক্তাদের পরিহার করা।

ইতোমধ্যে এ বছরের আলিম ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়, পরিশ্রমের পর যারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও অভিনন্দন। এ বছরের পরীক্ষায় পাসের হার ৫২ দশমিক ১২ শতাংশ। ২০২৫ সালে পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। তবে এবারের আলিম ও এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া পরীক্ষার্থীরা কেবল ফেল করা বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

আলিম ও এইচএসসি উত্তীর্ণদের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশের এই সময়টি একজন শিক্ষার্থীর জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য আজ থেকেই পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার বিষয় নির্বাচন, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং নিজেকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়; বরং জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ও নৈতিকতা অর্জন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্ভবপর হয়। আলিম ও এইচএসসি/সমমান উত্তীর্ণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আগামীর পথচলা আরও সুন্দর, নিরাপদ, সাফল্যমণ্ডিত ও কল্যাণকর হোক।



আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

অনুবাদঃ দুনিয়া এবং আখিরাত সম্বন্ধে। আরও তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, 'তাদের কল্যাণ সাধন করাই উত্তম।' আর তোমরা যদি তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকো, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী। আল্লাহ চাইলে তোমাদের এ বিষয়ে কঠিন সংকটে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা, আয়াত-২২০)

তাফসীর

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

-তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কিত প্রশ্ন করছে। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি বলে দিন। ইয়াতীমদের সংশোধন কল্পে তোমরা যদি তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশ্রিত কর, তাহলে ভালো কথা। তারাও তোমাদের ভাই। আহলে ইলমরা এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ নিয়ে ইখতেলাফ করেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এ আয়াত নাযিল হয় তখন তারা ইয়াতীমের মাল নিজেদের থেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন অতঃপর তারা এ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন-

وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

-তোমরা যদি তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকো, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী। আল্লাহ চাইলে তোমাদের এ বিষয়ে কঠিন সংকটে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর তারা সবকিছু একিভূত করল।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তাআলা

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

এ আয়াত নাযিল করেন, তখন যাদের তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম ছিল, তারা ইয়াতীমদের খাবার নিজেদের খাবার থেকে এবং তাদের পানীয় নিজেদের পানীয় থেকে পৃথক করে নিলেন। ফলে ইয়াতীমের খাবার থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তার জন্য রেখে দেওয়া হতো, যতক্ষণ না সে তা খেয়ে নিত অথবা খাবারটি নষ্ট হয়ে যেত। এটি তাদের উপর অত্যন্ত কঠোরতা হয়ে গেল। তখন তাঁরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

-অতঃপর তারা তাদের খাবারের সাথে ইয়াতীমদের সম্পদও মিশিয়ে নিল।[১]

অপরাপর তাবীলকারীরা বলেন, আরবদের চরিত্র ছিল তারা ইয়াতীমদের মাল থেকে পরহেজ করত এবং তা পরিত্যগ করত। তাদের জন্য কষ্টকর হওয়ায় তারা এ বিষয়ে ফতোয়া জানতে চাইলেন। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, আরবরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করত। এমনকি তারা এক পাত্রে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করত না। তাদের জন্য উটে আরোহণ করে চলাফেরা করার ব্যবস্থা করা হতো না, তাদের জন্য খাদিমের ব্যবস্থা করা হতো না। আরবরা এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর খিদমতে আসলেন এবং রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বলেন, তাদের মালের সংশোধন এবং দেখা-শুনা করার লক্ষ্যে তাদের সাথে মিলে এক সাথে খাওয়া, নিজ আরোহীতে সাওয়ার করা, মাল উঠানো, তাদের জন্যে খাদিম ঠিক করা- তা সত্যিই উদারতার বহিঃপ্রকাশ।[২]

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

-আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ জানেন, কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী। অর্থাৎ তুমি যখন তোমার সম্পদ ইয়াতীমের সম্পদের সঙ্গে মিশিয়ে নাও, তখন আল্লাহ জানেন তুমি কি তার সম্পদের কল্যাণ সাধন করতে চাও, নাকি তা নষ্ট করতে চাও, যাতে অন্যায়ভাবে তা ভক্ষণ করতে পারো?[৩]

আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ

-আল্লাহ চাইলে তোমাদের এ বিষয়ে কঠিন সংকটে ফেলতে পারতেন।

অর্থাৎ, তোমরা যদি অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাও, এর পরিণামে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে অবশ্যই তা তোমাদের থেকে বের করে নিতে পারেন। তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য বিধানসমূহ প্রশস্ত ও সহজ করে দেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

আর যে ব্যক্তি সচ্ছল, সে যেন কোনো কিছু গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। আর যে অভাবগ্রস্ত, সে যেন ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করে।[৪]

কোনো কোনো তাবীলকারী বলেন, উক্ত আয়াতের মূল কথা হচ্ছে- তোমরা যদি অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল খাও, তাহলে জেনে রাখো তা অবশ্যই তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ইয়াতীমের মাল খাওয়ার কারণে তোমাদের অনেক ধ্বংসাত্মক মুসীবত আসতে পারে।[৫]

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার রাজত্বে পরাক্রমশীল এবং বিজ্ঞ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর কর্তৃত্বে মহাপরাক্রমশালী। আর তিনি প্রজ্ঞাময়; অর্থাৎ, তিনি এমন প্রজ্ঞার অধিকারী, যাঁর কাছে পরিণাম ও পরিণতির বিষয়গুলো অজানা নয়।[৬]

আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ (الخ)

তাফসীরকারকদের মধ্যে এ আয়াতের তাফসীর নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এখানে কি সকল মুশরিকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে না কিছু সংখ্যক মুশরিকা মহিলার উপর হুকুম জারী করা হয়েছে? এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, সকল প্রকার মুশরিকা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেকোনো প্রকারের মুশরিকা মহিলা হোক তাকে বিয়ে করা মুসলমানের জন্য হারাম। সে মুশরিকা মহিলা মূর্তি উপাসক হোক, হোক ইয়াহুদী মহিলা, হোক খ্রিষ্টান মহিলা, হোক অগ্নি উপাসক বা অন্য যেকোনো ধরনের মুশরিকা। পরবর্তীতে আহলে কিতাবকে নিকাহ করার যেই হারাম হুকুম ছিল তা বাতিল হয়ে যায় নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। মুমিন মুহসিনা মহিলা ও তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের সতী মহিলা তোমাদের জন্য বিয়ে করা হালাল। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫)

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী- وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ -আয়াত হতে আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে বের করা হয়েছে নিম্নের আয়াত দিয়ে–

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ- إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[৭]

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হবে পশ্চিমা মুশরিকাদের বেলায়। এ আয়াত হতে সামান্যতম কিছু মানসুখও হয় নাই এবং ইস্তেসনাও করা হয়নি। কারণ আয়াত আম ও স্পষ্ট, তার তাবিল হচ্ছে খাস।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এখানে মুশরিকা মহিলা বলে আরবের মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ তাদের কোনো কিতাব নেই, যা তারা পাঠ করবে। তিনি আরো বলেন, المشركات বলে এ সকল মুশরিকা মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা আহলে কিতাব নয়। তিনি দলীল হিসেবে উদ্ধৃতি প্রদান করে বলেন, হযরত হুযাইফা (রা.) জনৈক ইয়াহুদী বা নাসরানী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।[৮]

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (র.) বলেন, মুশরিকা মহিলা বলে মূর্তি উপাসক মহিলাকে বুঝানো হয়। অপরাপর তাবীলকারীরা বলেন, এ আয়াতে সকল মুশরিকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে যে প্রকারের মুশরিকই হোক না কেন। অনির্দিষ্টভাবে সবধরণের মুশরিকা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। মূর্তি উপাসক, অগ্নি উপাসক, কিতাবী বলে কোনো কথা নেই। এর থেকে কাউকেও বাদ দেওয়া যাবে না।

হযরত শাহর বিন হাওশাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল ﷺ মুমিনা মুহাজিরা ছাড়া অন্য যেকোনো প্রকারের মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ -যে ঈমানের সাথে কুফরী করে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫)

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.) এক ইয়াহুদী মহিলাকে নিকাহ করেছিলেন এবং হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) এক নাসরানী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ফলে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাদের উপর খুবই রাগান্বিত হয়েছিলেন এমনকি তাদেরকে শাস্তি দেওয়ারও চিন্তা করেছিলেন। এতে তারা বলেছিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা তালাক দিচ্ছি। আপনি আমাদের উপর রাগ করবেন না। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, যদি তালাক দেওয়া জায়িয হয় তাহলে অবশ্যই বিয়ে করা জায়িয। এসব বক্তব্যের মধ্যে সর্বোত্তম বক্তব্য হচ্ছে, হযরত কাতাদা'র বক্তব্য। তিনি আল্লাহ তাআলার আয়াত وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতের মূল কথা হচ্ছে

যে মহিলা মুশরিকা আহলে কিতাব নয়, তাকে নিকাহ করবে না। যদিও আয়াত আম, কিন্তু এর ভিতরে কিছু খাস করার অবকাশ রয়েছে। এ আয়াত হতে কিছুই মানসূখ হয়নি, তবে আহলে কিতাবী মহিলারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিবাহ করা হালাল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

মুমিনদের জন্য জায়িয আহলে কিতাবের মুহসিনা ও পবিত্র মহিলাদেরকে নিকাহ করা, যেমনিভাবে মুমিন মহিলাদেরকে বিয়ে করা জায়িয।[৯] যেকোনো দুই আয়াত বা হাদীসের মধ্যে একটি যদি স্বভাবগত জ্ঞানের দ্বারা অপরটির হুকুমকে নফী করে, তবে তার একটির উপর রায় প্রদান জায়িয নয়। কারণ একটি অপরটির হুকুমের মানসূখকারী হতে পারে না, যতক্ষণ এমন অকাট্য কোনো খবর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না যায় যা আপত্তি উত্তাপনের অবকাশ আটকে দেয়। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে এমন কোনো দলীল নেই যে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ আয়াতটি মুশরিকা মহিলাদের বিবাহ করা হারাম সংক্রান্ত আয়াত وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ এর মানসূখকারী হবে। সুতরাং যখন এমন কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই, তখন কারও এ কথা বলা যে, 'এই আয়াত ওই আয়াতের বিধান রহিতকারী' এটি এমন একটি দাবি, যার পক্ষে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। আর যে ব্যক্তি প্রমাণহীন দাবি করে, সে মূলত স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত দেয়। এমন স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত দিতে তো যে কেউই সক্ষম। হ্যাঁ শহর বিন হাওশব হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) হতে দলীল হিসেব যে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, যেমন- হযরত তালহা এবং হুযাইফা রা. এর কথা। তাদের স্ত্রীও কিতাবী ছিলেন তা সত্বেও তাদেরকে পৃথক করা হয়েছে। এর উত্তর হচ্ছে, কুরআন হাদীসে এর বিপক্ষে রিওয়ায়াত থাকায় তা দলীল হতে পারে না। তাছাড়া হযরত উমর (রা.) হতে এর বিপরীত মর্মবোধক যে হাদীস সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে তা তালহা এবং হুযাইফা রা. সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ। আর সেই হাদীস হচ্ছে এই-

আমাকে হযরত মূসা বিন আবদুর রহমান আল মসরুকী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন বশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত সুফইয়ান বিন সাইদ বর্ণনা করেন, তিনি ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, মুসলিম পুরুষ নাসরানী মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে কিন্তু কোনো নাসরানী পুরুষ মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে না। আর তালহা এবং হুযাইফার নিকাহকে হযরত উমর (রা.) এজন্য অপছন্দ করেছেন, হয়তঃ তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য মুসলিমরা ইয়াহুদী এবং নাসরানী মহিলাকে নিকাহ করবে এবং মুসলিম মহিলার প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে অথবা অন্য কোনো বিবেচনা থাকতে পারে এ আশংকায় তিনি তার তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাদের স্ত্রী পরিত্যাগের নির্দেশ দেন।

অনুরূপভাবে হযরত আবূ কুরাইব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবন ইদরীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সলত বিন বাহরাম বর্ণনা করেন, তিনি হযরত শকীক হতে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, হযরত হুযাইফা (রা.) এক ইয়াহুদী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর নিকট চিঠি লিখেন তার পথ ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি হযরত উমরের কাছে লেখেন, হে উমর! আপনি কি মনে করেন এ মহিলা হারাম? যদি তাই মনে করেন তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে সমস্যা সমাধান করছি। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, না। আমি হারাম মনে করছিনা কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এসব মহিলার কারণে মুমিনা মহিলার প্রতি অন্যায় করা হবে।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, আমরা আহলে কিতাব মহিলাদেরকে নিকাহ করবো; কিন্তু কোনো আহলে কিতাবী পুরুষ যেন আমাদের মহিলাদেরকে নিকাহ না করে। যদিও এ হাদীসের সনদের মধ্যে কথা রয়েছে, তথাপি এই বক্তব্য অগ্রাধিকার পাবে কেননা এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

হযরত আবদুল হামিদ বিন বাহরামের বর্ণনা সম্পর্কে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে- হযরত শাহর বিন হাওশাব হতে যে হাদীস রিওয়ায়াত হয়েছে তার অর্থ হবে- হে মুমিনগণ! তোমরা মুশরিকা কিতাবী নয় এমন মহিলাকে নিকাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উপর আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন, তা বিশ্বাস করে।

১. তাবারী, ৪/৩৪৯-৫০; ২. তাবারী, ৪/৩৫৩-৩৫৪; ৩. তাবারী, ৪/৩৫৮; ৪. তাবারী, ৪/৩৫৯; ৫. তাবারী, ৪/৩৬০; ৬. তাবারী, ৪/৩৬১; ৭. তাবারী, ৪/৩৬২; ৮. তাবারী, ৪/৩৬৩-৩৪৬; ৯. তাবারী, ৪/৩৬৪-৩৬৫;

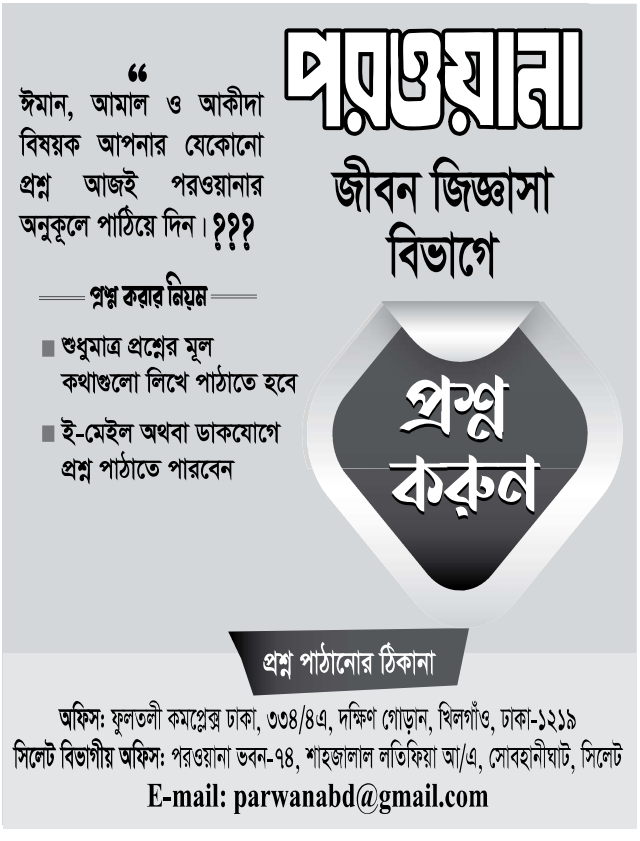

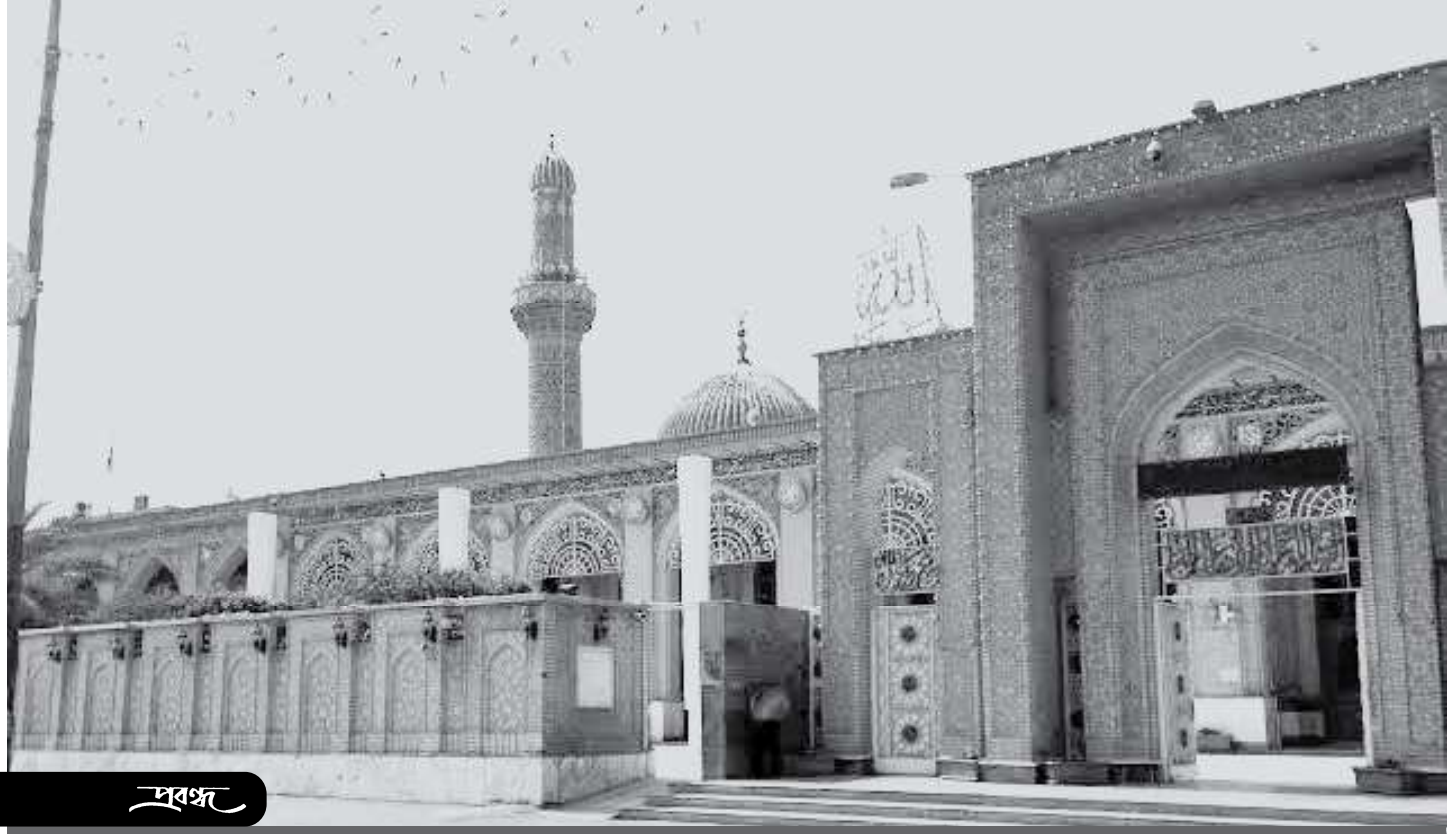

প্রবন্ধ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ফিকহী বিচক্ষণতা

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

বর্তমান সময়ে একশ্রেণির তরুণ সমালোচকের ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, অমূলক অভিযোগ এবং বিরূপ সমালোচনা আমাকে এই মহান ইমামের জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশেষত, তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন বক্তব্যের সত্যতা যাচাই এবং যথাসম্ভব প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ থেকে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমি যতই ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনচরিত, আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, অসাধারণ ইলমী যোগ্যতা এবং ইসলামী জ্ঞানভান্ডারে তাঁর অতুলনীয় অবদান সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি, ততই বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। তাঁর গভীর জ্ঞান, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্ম ফিকহী বিশ্লেষণ এবং শরীআতের বিধিবিধান উদঘাটনে অসামান্য দক্ষতা আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে।

আমার গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি এবং জটিল ফিকহী সমস্যার সমাধানে তাঁর বিস্ময়কর বিচক্ষণতা। প্রাচীন মনীষীদের বর্ণনায় সংরক্ষিত তাঁর জীবনের এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যেগুলো তাঁর অনন্য প্রতিভা ও ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

আশা করি, এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসাধারণ ফিকহী প্রজ্ঞা, গভীর জ্ঞান ও অনন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন।

শুরুতে ইমাম আবূ হানীফার ভালোবাসা সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়ে দুজন মহান ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

ইমাম আবদুল আযীয ইবন আবী রাওয়াদ (মৃ. ১৫৯ হি.) ইমাম আবদুল আযীয ইবন আবী রাওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৫৯ হি.) ছিলেন মসজিদুল হারামের ইমাম, একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ইবাদতগুযার ব্যক্তিত্ব।

ইমাম আস-সাইমারী (মৃ. ৪৩৬ হি.) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন:

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ: أَبُو حَنِيفَةَ الْمِحْنَةُ، مَنْ أَحَبَّ أَبَا حَنِيفَةَ فَهُوَ سُنِّيٌّ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ

-ইমাম আবদুল আযীয ইবন আবী রাওয়াদ বলেছেন, 'ইমাম আবূ হানীফা হলেন পরীক্ষার মানদণ্ড। যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফাকে ভালোবাসে, সে সুন্নী; আর যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে বিদআতী।'[১]

এখানে أَبُو حَنِيفَةَ الْمِحْنَةُ অর্থ—'ইমাম আবূ হানীফা হলেন পরীক্ষার মানদণ্ড।' অর্থাৎ ইমাম আবদুল আযীয ইবন আবী রাওয়াদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ইমাম আবী হানীফার প্রতি ভালোবাসা বা বিদ্বেষের মাধ্যমে ব্যক্তির

মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমাম আবদুল আযীয ইবন আবী রাওয়াদ ইমাম বুখারীর হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে ৭৫৩ ও ৩৫৮৩ নম্বর হাদীসে তাঁকে অন্য রাবীর সঙ্গে যুক্তভাবে উল্লেখ করেছেন; স্বতন্ত্রভাবে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেননি।

এখানে ইমাম আবদুল আযীয ইবন আবী রাওয়াদের বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি ভালোবাসাকে সুন্নীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষকে বিদআতীদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম হাফিয হুজ্জাত আবূ মুআবিয়াহ আস-সাদী আল-কূফী আদ-দারীর (মৃ. ১৯৫ হি.)

ইমাম আবূ মুআবিয়াহ আস-সাদী আল-কূফী আদ-দারীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৯৫ হি.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইমাম, হাফিযুল হাদীস ও হাদীসশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইমাম ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মাঈনের শিক্ষক।

ইমাম আবূ মুআবিয়াহ বলেছেন,

حُبُّ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ السُّنَّةِ

-ইমাম আবূ হানীফার প্রতি ভালোবাসা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[২]

ইমাম আবূ মুআবিয়াহ নিজেও ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সহীহ বুখারীরও একজন হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী তাঁর সূত্রে বিভিন্ন স্থানে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাসক কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফাকে ফাতওয়া প্রদান করতে নিষেধাজ্ঞা

ইমাম ইবন আবদিল বার আল-মালিকী (মৃ. ৪৬৩ হি.) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন,

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيِّ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ مَجْنُونَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عِمْرَانَ. مَرَّ بِهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ لَهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ! وَابْنُ أَبِي لَيْلَى قَائِمٌ يَسْمَعُ.

-ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ আল-লু'লুঈ বলেছেন, 'আমাদের এলাকায় একজন মানসিক ভারসাম্যহীন নারী ছিল। তাকে উম্মে ইমরান বলা হতো। একদিন একজন লোক তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কিছু বলল। তখন সেই নারী তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে দুই ব্যভিচারীর সন্তান!

এ সময় বিচারক ইবন আবী-লাইলা সেখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিলেন।

فَأَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا، فَأَدْخَلَهَا الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِيهِ، فَضَرَبَهَا حَدَّيْنِ: حَدًّا لِأَبِيهِ، وَحَدًّا لِأُمِّهِ.

-তখন ইবন আবী লাইলা সেই নারীকে তাঁর সামনে হাযির করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে মসজিদের ভেতরে নিয়ে আসা হলো। সেখানে তিনি ওই নারীকে দুটি হদ্দের শাস্তি দিলেন—একটি লোকটির পিতাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার কারণে এবং অপরটি তার মাতাকে একই অপবাদ দেওয়ার কারণে।

ইমাম আবূ হানীফা বিচারক ইবন আবী লাইলার সিদ্ধান্তে ছয়টি ভুল চিহ্নিত করেন

فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهَا مِنْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ.

-এই ঘটনা ইমাম আবূ হানীফার কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, এ ঘটনায় ইবন আবী লাইলা ছয়টি ক্ষেত্রে ভুল করেছেন।

প্রথম ভুল: মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ওপর হদ্দের শাস্তি প্রয়োগ

الْمَجْنُونَةُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا.

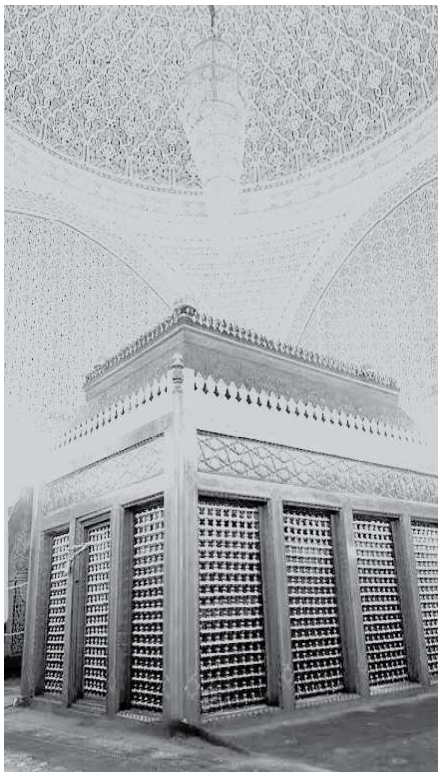

-মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ওপর হদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য নয়।

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার মতে, ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় তার ওপর হদ্দের শাস্তি প্রয়োগ করা সঠিক হয়নি।

দ্বিতীয় ভুল: মসজিদের ভেতরে হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা

وَأَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ.

-তিনি মসজিদের ভেতরে তার ওপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করেছেন। অথচ মসজিদে হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা হয় না।

তৃতীয় ভুল: নারীকে দাঁড় করিয়ে প্রহার করা

وَضَرَبَهَا قَائِمَةً، وَالنِّسَاءُ يُضْرَبْنَ قُعُودًا.

-তিনি নারীটিকে দাঁড় করিয়ে প্রহার করেছেন। অথচ নারীদের বসা অবস্থায় প্রহার করা হয়।

চতুর্থ ভুল: একই ঘটনায় দুটি হদ্দের শাস্তি প্রদান

وَأَقَامَ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ قَوْمًا مَا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

-তিনি তার ওপর দুটি হদ্দের শাস্তি কার্যকর করেছেন। অথচ কোনো ব্যক্তি একদল লোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলেও তার ওপর একটি হদ্দের শাস্তিই প্রযোজ্য হবে।

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার উল্লিখিত ফিকহী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়ার কারণে পৃথক পৃথক হদ্দ কার্যকর করা সঠিক হয়নি।

পঞ্চম ভুল: অপবাদের শিকার ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে শাস্তি কার্যকর করা

وَضَرَبَهَا وَالْأَبَوَانِ غَائِبَانِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَحْضَرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ يَطْلُبُهُ.

-তিনি নারীটিকে এমন অবস্থায় প্রহার করেছেন, যখন অপবাদের শিকার পিতা-মাতা উভয়েই অনুপস্থিত ছিলেন। অথচ তাদের উপস্থিতি ছাড়া এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করা যায় না। কারণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে শাস্তির দাবি উত্থাপিত না হলে এ হদ্দ কার্যকর হয় না।

ষষ্ঠ ভুল: বিরতি ছাড়া পরপর দুটি হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা

وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَمَنْ وَجَبَ

عَلَيْهِ حَدَّانِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَجِفَّ الْآخَرُ، ثُمَّ يُضْرَبَ الْحَدَّ الثَّانِي.

-তিনি একই সময়ে দুটি হদ্দের শাস্তি একত্রে কার্যকর করেছেন। অথচ কারও ওপর দুটি হদ্দের শাস্তি আবশ্যক হলে প্রথম শাস্তির আঘাতের ক্ষত শুকিয়ে সুস্থ হওয়ার আগে দ্বিতীয় শাস্তি কার্যকর করা যায় না। এরপর দ্বিতীয় হদ্দের শাস্তি প্রদান করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে শাসকের কাছে অভিযোগ

فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَذَهَبَ إِلَى الْأَمِيرِ فَشَكَاهُ، فَحَجَرَ الْأَمِيرُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُفْتِيَ.

-ইমাম আবূ হানীফার এই সমালোচনার কথা ইবন আবী লাইলার কাছে পৌঁছালে তিনি শাসকের কাছে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। ফলে শাসক ইমাম আবূ হানীফাকে ফাতওয়া প্রদান করতে নিষেধ করলেন।

এরপর বর্ণনাকারী বলেন,

فَهَذِهِ قِصَّةُ حَجْرِ الْأَمِيرِ فِي الْفُتْيَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ.

-ইমাম আবূ হানীফাকে শাসক কর্তৃক ফাতওয়া প্রদান থেকে নিষিদ্ধ করার ঘটনাটি এটাই।

পুনরায় ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি

ثُمَّ وَرَدَتْ مَسَائِلُ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى، فَسُئِلَ عَنْهَا أَبُو حَنِيفَةَ، فَأَجَابَ فِيهَا، فَاسْتَحْسَنَ عِيسَى كُلَّ مَا جَاءَ بِهِ، وَأَذِنَ لَهُ، فَقَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ.

-এরপর ঈসা ইবন মূসার পক্ষ থেকে কয়েকটি মাসআলা উত্থাপিত হলো। সেগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রত্যেকটির উত্তর প্রদান করলেন। ঈসা ইবন মূসা তাঁর প্রদত্ত সব উত্তর অত্যন্ত উত্তম মনে করলেন এবং তাঁকে পুনরায় ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দিলেন। ফলে ইমাম আবূ হানীফা আবার নিজের ইলমী মজলিসে বসতে শুরু করলেন।[৩]

ইমাম আবূ হানীফার যুক্তি, অতঃপর ওসীয়তের রায়

এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর আগে তিনি ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তার সম্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য ওসী বা ওসীয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা অনুপস্থিত ছিলেন।

পরে ইমাম আবূ হানীফা ফিরে এসে বিচারক ইবন শুবরুমাহর আদালতে উপস্থিত হলেন এবং বিষয়টি তাঁর কাছে তুলে ধরলেন।

তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণও উপস্থিত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর আগে তাঁকে ওসী নিযুক্ত করেছেন।

তখন বিচারক ইবনে শুবরুমাহ বললেন,

يَا أَبَا حَنِيفَةَ، أَتَحْلِفُ أَنَّ شُهُودَكَ شَهِدُوا بِحَقٍّ؟

-হে আবূ হানীফা! আপনি কি শপথ করবেন যে, আপনার সাক্ষীরা সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন?

ইমাম আবূ হানীফা বললেন,

لَيْسَ عَلَيَّ يَمِينٌ، كُنْتُ غَائِبًا.

-আমার ওপর শপথ করা আবশ্যক নয়। কারণ, আমি তখন অনুপস্থিত ছিলাম।

তখন বিচারক ইবন শুবরুমাহ বললেন:

ضَلَّتْ مَقَايِسُكَ.

-আপনার কিয়াসগুলো তো ভুল পথে চলে গেছে!

তখন ইমাম আবূ হানীফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا تَقُولُ فِي أَعْمَى شُجَّ، فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ؟

-আপনি এমন একজন অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলবেন, যার মাথায় আঘাত করা হয়েছে এবং সেই ঘটনার পক্ষে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন?

এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন,

أَعَلَى الْأَعْمَى أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ شُهُودَهُ شَهِدُوا بِحَقٍّ وَهُوَ لَمْ يَرَ؟

-সেই অন্ধ ব্যক্তির ওপর কি এ মর্মে শপথ করা আবশ্যক হবে যে, তার সাক্ষীরা সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন, অথচ সে নিজে ঘটনাটি দেখেনি?

ইমাম আবূ হানীফার এই যুক্তি শোনার পর বিচারক ইবন শুবরুমাহ তাঁর পক্ষে ওসীয়তের রায় প্রদান করলেন এবং তাঁকে ওসী হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুমোদন দিলেন।

فَحَكَمَ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِالْوَصِيَّةِ وَأَمْضَاهَا لَهُ.

-অতঃপর বিচারক ইবন শুবরুমাহ ইমাম আবূ হানীফার পক্ষে ওসীয়তের রায় প্রদান করলেন এবং তা তাঁর জন্য কার্যকর করে দিলেন।[৪] (চলবে)

---

১ ইমাম আবূ আবদিল্লাহ আল-হুসাইন ইবন আলী আস-সাইমারী (মৃ. ৪৩৬ হি.), أَخْبَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহি), পৃষ্ঠা ৮৬। প্রকাশক: আলামুল কুতুব, বৈরুত। প্রকাশকাল: ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠা: ১৭৩।

২ ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.), سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪০১।

৩ ইমাম আবূ উমর ইউসুফ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবদিল বার আল-আন্দালুসী আল-মালিকী (মৃ. ৪৬৩ হি.), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْفُقَهَاءِ (আল-ইন্তিকা ফী ফাদ্বাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা), পৃষ্ঠা ১৫২–১৫৩।

৪ ইমাম আবূ উমর ইউসুফ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবদিল বার আল-আন্দালুসী আল-মালিকী (মৃ. ৪৬৩ হি.), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْفُقَهَاءِ(আল-ইন্তিকা ফী ফাদ্বাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা), পৃষ্ঠা ১৫৩।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-

২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-

ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-

ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-

ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-

ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-

ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-

ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন

তাসনীম تسنيم
www.tasneembd.org

▼ কুরআন ▼ হাদীস ▼ আকীদা
▼ ইবাদত ▼ প্রবন্ধ ▼ জীবনী
▼ জিজ্ঞাসা ▼ বই





শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার দরসগাহ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলার মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন

জুলফিকার মুরতাজা

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করলেও এর সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক কাঠামো এখনো উত্তর উপনিবেশবাদী কাঠামোর মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে। প্রায় শত বছর পূর্বে উপনিবেশবাদের বাহ্যিক দফারফা হলেও দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন শাসিত অঞ্চলের মানুষের মানস্পটে যে অবধারিত পরিবর্তন এবং ক্ষেত্রেবিশেষে যে পরোক্ষ আনুগত্যের জন্ম দিয়েছে তা-ই উত্তর উপনিবেশবাদের মূল চালিকা শক্তি। দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ জনগণের শারীরিক কাঠামো থেকে সামাজিক কাঠামো পর্যন্ত সর্বত্র ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের শোষনের দগদগে স্মৃতি সুস্পষ্ট হলেও এতদঞ্চলের শিক্ষিতজন তো বটেই, এমনকি প্রান্তিক জনতার বিপুল অংশের চিন্তায় এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যে, ব্রিটিশ উপনিবেশ অত্যাচারী ছিলো ঠিক, কিন্তু তাদের শাসন এদেশের মানুষের উপকারও করেছে অনেক, তাদের শাসন এদেশকে সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে সহায়তাও করেছে ঢের। উত্তর উপনিবেশবাদী সমাজের ব্যাপক অংশের কাছে উপনিবেশবাদের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কৃতজ্ঞতা এতো বেশি যে, তারা নিজেদের থেকে শাসক রাষ্ট্রকে মহত্তর ভাবতে অভ্যস্ত তো হয়ই, একই সাথে এই অঞ্চল শাসন করতে উপনিবেশিক শক্তি যাদের সাহায্য নিয়েছে, যাদেরকে সহযোগিতা করে সমাজের অগ্রগামী অংশ হিসেবে "ব্র্যান্ডিং" করা হয়েছে তাদেরকেও সাধারণ জনতা নিজেদের থেকে মহত্তর ভাবার ভ্রমজালে আবদ্ধ থাকে। ব্রিটিশদের দ্বারা দক্ষিণ এশিয় সমাজের উপর আরোপিত এই অগ্রগামী গোষ্ঠী ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ হিন্দুরা, যাদেরকে প্রভুজ্ঞান করা, যাদের তথাকথিত করুণার কথা প্রান্তিকজনকে স্মরণ করিয়া দেওয়া আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চালকরা নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যক করে নিয়েছেন। এটিই উত্তর উপনিবেশবাদী ঘূর্ণাবর্ত।

যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বাংলার উত্তর উপনিবেশবাদী কাঠামো ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি ও তাদের সহযোগী শক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ হিন্দুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ছড়ানোর চেষ্টা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষাবিষয়ক আলাপ। বাংলাদেশে চলমান যেকোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার সূচনাবিন্দু হিসেবে লেখক ও গবেষকরা কলকাতা আলিয়া মাদরাসা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ এবং দেওবন্দ মাদরাসা এই চারটিকেই সাধারণত গ্রহণ করেন। ফলে বর্তমানে প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকেই শুরু হয়েছে এরকম একটি পরোক্ষ ঐকমত্যের সুর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এই বিভ্রান্তিকর ঐকমত্যের সুরের ফলে এই

জাতির উপর যে বিপজ্জনক বিশ্বাস আরোপিত হয়েছে তা হলো- ব্রিটিশরা যাই করুক না কেন, বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সকল ধরণের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার বুনিয়াদ বা ভিত্তি ব্রিটিশরাই স্থাপন করেছে; ব্রিটিশদের আগমন না হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়তো সেকেলেই থেকে যেতো। আরো বিপজ্জনক বিশ্বাস হলো বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, মুসলমানরা এর থেকে উন্নততর স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ্ধতির সূচনা করতে পারেনি বলেই ব্রিটিশদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি এবং ব্রিটিশদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ এই জনপদের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাংশ জুড়ে বিরাজমান। এসব বিভ্রান্তিকর ও অমূলক বিশ্বাস এই জাতির মনস্তত্ত্বে স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে মূলত প্রাক ঔপনিবেশিক কাল তথা ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস চর্চায় ব্যাপক শূন্যতার কারণে। যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির সূচনা কোন না কোনভাবে ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই, তাই এর পূর্বে তথা ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনামলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা যে ঈর্ষণীয় রকমের সফল ছিলো এবং দুনিয়ার যেকোন প্রান্তের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রগামী ছিলো, এই সত্য আজকাল উচ্চারণ করলেও বহু মুসলমানের কাছে এখনও এগুলা অত্যুক্তি এবং অতীত ইতিহাস নিয়ে রোমান্টিসিজম বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলায় মুসলমানদের শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অল্পবিস্তর যা-ই আলোচনা হয় তার মূল বক্তব্য থাকে এরকম যে, মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিলো মসজিদ এবং সূফীদের খানকাহ। আপাতদৃষ্টিতে এই কথার মধ্যে কোন ভুল নেই। কিন্তু এই জাতির উত্তর উপনিবেশবাদী মনন যে মসজিদ ও খানকাহ ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি বলতে কেবলই মক্তব ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বুঝে, মুসলমানী আমলের মসজিদ ও খানকাহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে এর থেকে ভিন্নতর ছিলো এ বিষয়ে প্রায় তেমন আলোচনাই পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমানদের শাসনকালে শিক্ষাব্যবস্থা মসজিদকেন্দ্রিক ছিলো এই আলাপের ফলে অবচেতনভাবে আরো একটি চিন্তা অনেকের মনে প্রোথিত হয়েছে যে, হয়তো সেসময় স্বতন্ত্র কোন বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলায় গড়ে ওঠেনি, যা নিতান্তই ভুল ধারণা। বস্তুত, খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত সময়কালে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা তথা বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্র ছিলো মসজিদ এবং আউলিয়ায়ে কিরামের খানকাহ। এর পাশাপাশি বাংলার নানা প্রান্তে বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেগুলোর ক্যারিকুলাম বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার মতো এককভাবে ইসলাম শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বর্ণযুগের বাগদাদ, কূফার শিক্ষা ব্যবস্থার মতো তাফসীর, হাদীস, ফিকহের পাশাপাশি দর্শন, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। মুসলমানদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মূলোৎপাটন করে ব্রিটিশরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে যে নবতর শিক্ষার সূচনা করেছিল তা যে কোনোভাবেই পূর্বের ব্যবস্থা থেকে উন্নততর ছিলো না, বরং বহুলাংশে মুসলমানদেরকে মূল ধারা থেকে ছুড়ে ফেলার মানসে এক ধরণের ভাষা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্রুসেড ছিলো, তা বর্তমান সময় আলোচনার দাবি রাখে।

> বাংলার মুসলমানের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশ আর বর্ণ হিন্দুদের "দয়ায়" শিক্ষিত হয়েছে এই ভাবনা ততক্ষণ এতদঞ্চলের মুসলমানের মন থেকে মুছবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আর হিন্দু কলেজের লিগ্যাসে এই জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোনারগাঁতে শাইখ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার বিশ্ববিখ্যাত দরসগাহ কিংবা গৌড়ের বিখ্যাত দরাসবাড়ি মাদরাসাসহ বাঘা, লক্ষ্মৌতি, মহিসন্তোষের দরসগাসমূহের লিগ্যাসির ধ্বংসাবশেষের উপরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা বাংলার দেওয়ানী হস্তগত করার পাশাপাশি, মীর জাফর কর্তৃক লাখ লাখ মুসলিম সৈনাদের চাকুরিচ্যুত করার ফলে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই ইসলামী শিক্ষালয়সমূহ যে অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়েছিল তা প্রকটতর হয়ে ওঠে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অসংখ্য মুসলিম জমিদারের জমিদারি হারানোর মাধ্যমে।

আলোচনার শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছিল- উত্তর ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের একটি বিপজ্জনক দিক হলো এই মনস্তত্ত্ব যারা লালন করেন তারা ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে নিজেদের থেকে মহত্তর তো মনে করেনই, উপরন্তু একই জনপদে বসবাসকারী কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুদের সহায়ক শক্তিকেও তারা নিজেদের থেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবার বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেন না। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের সহযোগী ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ হিন্দুদের প্রতি এমনই একটি ধারণা আজও আমাদের সমাজের নানা বর্গের মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে বলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে শতাব্দী প্রাচীন যেসব স্কুল এবং কলেজ রয়েছে এর অনেকগুলোর প্রতিষ্ঠার সাথে ব্রিটিশদের পাশাপাশি অনেক হিন্দু জমিদার শ্রেণির নামও বিপুলভাবে উচ্চারিত হয়। পুরনো কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়ের নামের মধ্যে সেসব হিন্দু জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নাম এখনো মওজুদ রয়েছে। জগন্নাথ কলেজ, এমসি কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ ইত্যাদি বহু নাম! এইসব নামকে স্মরণ করিয়ে আজকাল বহু ব্রাহ্মণ্যবাদের অনেক সাংস্কৃতিক প্রজাকে বাংলার মুসলমানকে "খোটা" দিতে দেখা যায় যে, "বাংলার আনাচেকানাচে শিক্ষাবিস্তার হিন্দুরাই করেছে, হিন্দু জমিদাররা না থাকলে তোমরা আজো চাষাভুষা থাকতা"। ব্রিটিশদের সহযোগী কলকাতার বর্ণ হিন্দুদের সাংস্কৃতিক প্রজা এসব আরোপিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির খোটা শুনে বাংলার মুসলমানের মনেও এক রকমের হীনমন্যতার জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সত্যিই তো চারপাশের বিদ্যালয়সমূহে কত শত হিন্দুজনের নাম, তারা ছাড়া কোথায় থাকতো মুসলিম চাষাভুষার ছেলেরা?

এই চিন্তা ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকবে যতক্ষণ না সে জানবে যে ব্রিটিশরা এই তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাধারার সূচনাকালে মুসলিম শাসকদের যে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল তা কোন অংশেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কম উন্নত ছিলো না। বাংলার মুসলমানের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশ আর বর্ণ হিন্দুদের "দয়ায়" শিক্ষিত হয়েছে এই ভাবনা ততক্ষণ এতদঞ্চলের মুসলমানের মন থেকে মুছবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আর হিন্দু কলেজের লিগ্যাসে এই জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোনারগাঁতে শাইখ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার বিশ্ববিখ্যাত দরসগাহ কিংবা গৌড়ের বিখ্যাত দরাসবাড়ি মাদরাসাসহ বাঘা, লক্ষ্মৌতি, মহিসন্তোষের দরসগাসমূহের লিগ্যাসির ধ্বংসাবশেষের উপরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা বাংলার দেওয়ানী হস্তগত করার পাশাপাশি, মীর জাফর কর্তৃক লাখ লাখ মুসলিম সেনাদের চাকুরিচ্যুত করার ফলে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই ইসলামী শিক্ষালয়সমূহ যে অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়েছিল তা প্রকটতর হয়ে ওঠে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অসংখ্য মুসলিম জমিদারের জমিদারি হারানোর মাধ্যমে। এরপরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে ইংরেজরা মুসলমানী যুগের শিক্ষাব্যবস্থা চিরতরে নির্মূলে বন্দোবস্ত করে, যার শেষ হয় ১৮৩৫ সালে শিক্ষাব্যবস্থায় ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি চালু করার মাধ্যমে। একই সময়ে চালু করা ইংরেজদের প্রতিষ্ঠানসহ এবং এর কয়েক দশক পরে হিন্দু জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশের মানুষকে পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প ইংরেজদের পছন্দসই ব্যবস্থা দিয়েছে মাত্র, এই ব্যবস্থা না থাকলে বাংলার মানুষ তথা বাংলার মুসলমান চাষাভুষা থাকতো এই কথার ন্যূনতম কোন ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার তার The Indian Musalmans গ্রন্থে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব ই.সি. বেইলি-কে উদ্ধৃত করেন। বেইলি বাংলার মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন- "তাদের শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চমাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ ও মননশীলতা অর্জনে সক্ষম ছিলো, যে ব্যবস্থা আমরা লুপ্ত করে দিয়েছি।... ভারতে প্রচলিত অন্য যেকোন শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় এটি বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর ছিলো। এই শিক্ষাব্যবস্থা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করেছিল"। মি. বেইলির এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ব্রিটিশদের চালু করা ক্যারিকুলামের উপর ভিত্তি করে বর্ণ হিন্দু জমিদাররা যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলায় গড়ে তুলেছিলেন এগুলো না থাকলেও বাংলার মুসলমান চাষাভুষা থাকতো না, বরং বাংলার মুসলমান আগে থেকেই নিজেদের উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এতদঞ্চলের অন্যদের থেকে (অর্থাৎ হিন্দুদের থেকেও) শ্রেষ্ঠতর ছিলো।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের বর্ণ হিন্দু সহযোগীদের বাংলাদেশি প্রজারা প্রায়ই যে ব্রিটিশরা না আসলে আর হিন্দু জমিদাররা না থাকলে বাংলার মুসলমানদের চাষাভুষা থাকতো বলে খোটা দেন এর অন্য একটা চমৎকার উৎস সম্ভবত রিচার্ড এম. ইটনের The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760 গ্রন্থটি। ইটন এই বইয়ে বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অত্যন্ত চমৎকার একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন যা নানাভাবে প্রশংসিত। কিন্তু বাংলায় সূফীরা কেবল কৃষকদের কৃষিকাজকে সহজ করে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং কেবল বুনিয়াদী ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন এটি সূফীদের নানা আঙিকের ইসলাম প্রচারের একটি ধরণ হলেও এটিকেই বাংলায় ইসলাম প্রচারের সর্বাংশ ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। সূফীরা বাংলায় কৃষি জমি আবাদে সেচের ব্যবস্থা করেছেন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছেন, আরব বণিকরা এদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক গভীর করেছেন, আবার গৌড় গোবিন্দ কিংবা লক্ষণ সেনদের বিরুদ্ধে শাহজালাল আর বখতিয়ার খিলজিরা তলোয়ার নিয়ে এসেছেন। সূফীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম, আরব বণিকদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম আর মুসলিম বীরদের বিজয়াভিজানে বিজিত এই বাংলা তথা ভারতে মুসলমানরা কখনোই কেবলই "চাষাভুষা" ছিলো না, ছিলো এই জনপদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল চালক।

[বাংলার মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থার গৌরবময় অতীত, ব্রিটিশ উপনিবেশের আরোপিত ক্যারিকুলামের সাথে দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আরোপিত ব্যবস্থাই বর্তমানের মূলধারা হয়ে ওঠার এই ঐতিহাসিক ক্রমধারা বিশ্লেষণের মাঝে লুকিয়ে আছে পৌত্তলিক ও মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের শত বছরের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মূল্যবোধের লড়াইয়ের সুদীর্ঘ যাত্রার ইতিহাস। শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের বিশ্লেষণ নিয়ে ধারাবাহিক এই আলোচনা চলমান থাকবে।]



প্রবন্ধ

দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা জানানোর শরঈ বিধান

ইব্রাহিম আরিফ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে মুসলমানের আকীদা, ইবাদত, সামাজিক সম্পর্ক এবং বিধর্মীদের সঙ্গে আচার-আচরণের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। দুর্গাপূজা হিন্দুধর্মের একটি ধর্মীয় উৎসব, যার আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা, মন্ত্রপাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে অংশগ্রহণ, ধর্মীয় সম্মতি প্রকাশ ও শুভেচ্ছা বিনিময় উৎসব উদযাপনেরই নামান্তর, যা তাওহীদের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা কিংবা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে উপাস্য হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

-নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করেন না; এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা, আয়াত-৪৮)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

-অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহফ, আয়াত-১১০)

কিয়ামতের আগে একদল নামধারী মুসলমানের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কিনা মুশরিকদের সাথে একাত্মতা পোষণ করবে এবং তাদের পূজা-অর্চনায় শরীক হবে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ

-ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তি পূজারীদের সাথে মিশে যাবে, আর কিছু লোক মূর্তি পূজা করবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস-২২১৯, সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-৪২৫২)

মূর্তি পুজারীদের সাথে মিশে যাওয়া নামধারী মুসলিমের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, সাধারণ সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামিক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও পূজা-অর্চনাকে নিজেদের উৎসব বলে আপন করে নিচ্ছেন! অথচ আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ফতওয়া দিয়ে বলেছেন—

اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي عِيدِهِمْ

-তাদের উৎসবের দিনে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের (উৎসবে অংশগ্রহণ) থেকে দূরে থাকো। (সুনান বাইহাকী ৯/৩৯২, হাদীস-১৮৮৬২)

অমুসলিমদের পূজা বা ধর্মীয় উৎসবে গিয়ে তা উপভোগ করা হারাম। এমনকি উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোও হারাম। আল্লাহর সাথে শরীক করা হয় এমন কাজ উপভোগ করা কিংবা একে কেন্দ্র করে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো কুফরের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি কেউ পূজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, অথবা তাদের শিরকী কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে নিঃসন্দেহে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

-তোমরা তাদের সাথে বসো না যতক্ষণ না তারা (কুফরী) আলোচনা থেকে বিরত হয়। অন্যথায় তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (সূরা নিসা, আয়াত-১৪০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন,

فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ، فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ

-এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গুনাহগারদের থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব, যখন তাদের থেকে কোনো গুনাহের কাজ প্রকাশ পায়। কেননা, যে ব্যক্তি তাদের থেকে দূরে থাকে না কেমন যেন সে তাদের গুনাহের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। আর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফর।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নতুবা তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে।"

অতএব, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের মজলিসে বসে থাকে এবং তাদের গুনাহের প্রতিবাদ করে না, সে গুনাহের ক্ষেত্রে তাদের মতোই সমান গুনাহগার হবে। তাই উচিত হলো তাদের পাপপূর্ণ কথা ও কাজের প্রতিবাদ করা । আর যদি তাদের প্রতিবাদ করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে তার উচিত সেখান থেকে উঠে চলে আসা, যাতে সে এই আয়াতের (এই কঠিন বিধানের) অন্তর্ভুক্ত না হয়। (তাফসীরে কুরতুবী, ৫/৪১৮)

এ ব্যাপারে উলামায়ে আহনাফের অনেকের বক্তব্য হলো,

مَنْ أَهْدَى لَهُمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ بَطِّيخَةً بِقَصْدِ تَعْظِيمِ الْعِيدِ، فَقَدْ كَفَرَ

-যে ব্যক্তি তাদের উৎসবের দিনে তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের কাউকে একটি তরমুজও উপহার দিল, সে অবশ্যই কুফরী করল। (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ২/৩৫০)

ইমাম ইবনু আবিদীন শামী (র.) তার বিখ্যাত 'রাদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

«وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ» أَيْ: الْهَدَايَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ، «وَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَهُ» كَمَا يُعَظِّمُهُ الْمُشْرِكُونَ، «يَكْفُرُ». قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ خَمْسِينَ سَنَةً، ثُمَّ أَهْدَى لِمُشْرِكٍ يَوْمَ النَّيْرُوزِ بَيْضَةً، يُرِيدُ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ، فَقَدْ كَفَرَ وَحَبِطَ عَمَلُهُ

-নওরোজ ও মেহেরজান (বিধর্মীদের উৎসব)-এর নামে কোনো কিছু প্রদান করা জায়িয নয়। অর্থাৎ, এই দুই দিনের নামে উপহার দেওয়া হারাম। আর যদি এর দ্বারা মুশরিকদের মতো উৎসবকে সম্মান করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে কুফরী করলো।

ইমাম আবু হাফস আল-কবীর (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি পঞ্চাশ বছর ধরে আল্লাহর ইবাদত করে, অতঃপর নওরোজের দিন কোনো মুশরিককে সেই দিনের প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে একটি ডিমও উপহার দেয়, তাহলে সে কুফরী করল এবং তার আমলও নিষ্ফল হয়ে গেল। (রাদ্দুল মুহতার, ৬/৭৫৪)

এর থেকে বুঝা যায়, দুর্গাপূজা বা অমুসলিমদের যেকোনো ধর্মীয় উৎসবে মুসলিমদের জন্য অংশগ্রহণ করা, শুভেচ্ছা জানানো, এবং উপহার আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বা হারাম। আর তাদের উৎসবকে সম্মান করা কুফরী।

কেননা মুশরিকদের উপর আল্লাহর লানত। বিশেষত তারা যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের পূজা-অর্চনায় মশগুল থাকে তখন তাদের উপর সরাসরি আল্লাহর গযব নাযিল হতে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো মুসলিম যদি তা উপভোগ করার জন্য তাদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হয় তবে সেও আল্লাহর গযবের সম্মুখীন হবে।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন,

وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের পূজা-উৎসবের দিনে তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করো না। কারণ সেসময় আল্লাহর গযব তাদের উপর নাযিল হয়। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৬০৯, সুনান বাইহাকী, হাদীস-১৮৮৬১)

অমুসলিমদের পূজা বা ধর্মীয় উৎসবে গিয়ে তা উপভোগ করা হারাম। এমনকি উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোও হারাম। আল্লাহর সাথে শরীক করা হয় এমন কাজ উপভোগ করা কিংবা একে কেন্দ্র করে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো কুফরের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি কেউ পূজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, অথবা তাদের শিরকী কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে নিঃসন্দেহে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন,

مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ، فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-যে ব্যক্তি অনারবদের দেশে বসবাস করে, অতঃপর নওরোজ ও মেহেরজান (বিধর্মীদের উৎসব) পালন করে এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, এমনকি এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, কিয়ামতের দিন তাদের হাশর ঐ লোকদের (বিধর্মীদের) সাথেই হবে। (সুনান বাইহাকী, হাদীস-১৮৮৬৩)

নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

من تشبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم

-যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (সুনান আবূ দাঊদ, হাদীস-৪০৩১)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) তার 'মিরকাতুল মাফাতিহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

«أَيْ: مَنْ شَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْكُفَّارِ مَثَلًا فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوِ الْفُجَّارِ أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالصُّلَحَاءِ الْأَبْرَارِ (فَهُوَ مِنْهُمْ): أَيْ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ... وَقَالَ قَاضِي خَانِ: رَجُلٌ اشْتَرَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ فِي غَيْرِهِ، إِنْ أَرَادَ بِهِ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا يُعَظِّمُهُ الْكَفَرَةُ يَكُونُ كُفْرًا.«

-অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাফির অথবা ফাসিক, ফুজ্জার, কিংবা সূফী ও নেককার পরহেজগারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, গুনাহ কিংবা নেকির ক্ষেত্রে (তাদের অনুরূপ হবে)।...

ইমাম কাজী খান (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নওরোজের দিন এমন কোনো জিনিস কিনে যা সে অন্য দিনগুলোতে কিনত না, এবং এর দ্বারা কাফিরদের মতো সেই দিনটিকে সম্মান জানানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা কুফরী হবে। (মিরকাত ৭/২৭৮২, হাদীস-৪৩৪৭)

মুসলমানদের উচিত নয় কোনো বাতিল ও শিরকী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

-আর তারা মিথ্যা ও অসত্য কাজে উপস্থিত হয় না; এবং অনর্থক বিষয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় মর্যাদার সঙ্গে অতিক্রম করে। (সূরা ফুরকান, আয়াত-৭২)

এ আয়াতের الزُّورَ শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বিভিন্ন মত উল্লেখ করার পর এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন,

وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِهِ أَنْ يُقَالَ: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ شَيْئًا مِنَ الْبَاطِلِ

অর্থাৎ, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকতর সঠিক বক্তব্য হলো, তারা কোনো ধরনের বাতিল কাজে উপস্থিত হয় না। (তাফসীরে তাবারী, ১৯/৩১৪)

তবে অমুসলিম প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা, তার বিপদে সাহায্য করা, অসুস্থতায় খোঁজ নেওয়া, ন্যায়বিচার করা ও তার সাথে মানবিক আচরণ করার ব্যাপারে শরীআতে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ সদাচারের অনুমতি থেকে ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ বা পূজার ধর্মীয় তাৎপর্যকে সমর্থন করার অনুমতি কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না।

বিধর্মীদের এইসব উৎসবের বিপরীতে মুসলমানদের জন্যও স্বতন্ত্র উৎসব রয়েছে। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে দেখলেন, সেখানকার লোকদের দুটি উৎসবের দিন রয়েছে। তিনি বললেন,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

-আল্লাহ তোমাদের ওই দুটি দিনের পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দুটি দিন দিয়েছেন, কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-১১৩৪, সুনান নাসাঈ, হাদীস-১৫৫৬)

এরপরও অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ, উদযাপন কিংবা নিরেট দর্শনার্থী হিসেবেও তাতে উপস্থিত হওয়া মুসলমানদের জন্য কোনোভাবেই বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে বিধর্মীদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানোও হারাম। কেননা তা মূর্তিকে সিজদা করার জন্য শুভেচ্ছা জানানোর নামান্তর । আর মূর্তিকে সিজদা করার জন্য শুভেচ্ছা জানানো নিঃসন্দেহে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (র.) বলেন,

وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ، مِثْلَ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ، فَيَقُولَ: عِيدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ، أَوْ تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ وَنَحْوِهِ، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ، بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ، وَأَشَدُّ مَقْتًا مِنَ التَّهْنِئَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَارْتِكَابِ الْفَرْجِ الْحَرَامِ وَنَحْوِهِ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا قَدْرَ لِلدِّينِ عِنْدَهُ يَقَعُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَدْرِي قُبْحَ مَا فَعَلَ، فَمَنْ هَنَّأَ عَبْدًا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ كُفْرٍ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ... إِلَخْ

-কোনো বিশেষ কুফরী কাজের শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন কাফিরদের পূজা-উৎসবে কিংবা উপবাসে তাদের এই বলে শুভেচ্ছা জানানো যে, 'তোমার উৎসব বরকতময় হোক' অথবা 'এই উৎসব তোমার জন্য আনন্দময় হোক' ইত্যাদি। এ ধরনের শুভেচ্ছা প্রদানকারী ব্যক্তি যদি কুফর থেকে নিরাপদও থাকে, তবুও তা হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ কাজটি এমন, যেন সে কোনো ব্যক্তিকে ক্রুশ (বা মূর্তির) সামনে সিজদা করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। বরং আল্লাহর নিকট এটি মদ পান, মানুষ হত্যা, যিনার মতো অন্যান্য গুনাহগুলোর ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়েও বড় গুনাহ ও ঘৃণিত কাজ। যাদের কাছে দ্বীনের কোনো গুরুত্ব নেই, তাদের অনেকেই এ কাজে লিপ্ত হয়; অথচ তারা যা করেছে, তা যে কত নিকৃষ্ট তাও জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো বান্দাকে গুনাহ, বিদআত কিংবা কোনো কুফরী কাজের জন্য শুভেচ্ছা জানায়, সে আল্লাহর আযাব ও গযবকে ডেকে নিয়ে আসে!... (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ১/২৯৩)

অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, শুভেচ্ছা জানানো এবং এগুলোকে উপলক্ষ্য করে যাবতীয় আনন্দ-আয়োজনের ব্যাপারে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ তা বান্দার ঈমানের জন্য বিপজ্জনক। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এটিকে সরাসরি কুফরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই আমাদের উচিত হলো ঈমান রক্ষার স্বার্থে এগুলো থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন।



জঙ্গে জামাল: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

জুনাইদ আহমদ মাশহুর

৩৫ হিজরী সন। ইসলামের তৃতীয় খলীফা, সায়্যিদুনা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধেছে চারিদিকে। মুসলিম ছদ্মবেশে থাকা ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবন সাবা ও তার অনুসারী সাবায়ীরা এই চক্রান্তের পেছন থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে খলীফা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে চলতে থাকা তাদের কু-প্রচার ও প্রতারণা এতটাই তীব্র রূপ ধারণ করেছে যে, সাবায়ী ও কতিপয় স্বার্থান্বেষী ছাড়াও সাধারণ লোকেরা তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। খলীফার অনিষ্টের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য সাবায়ীরা শক্তিও সঞ্চয় করে ফেলেছে। যার প্রতিক্রিয়া কূফা, বসরা, শাম ও মিশরে ধীরে ধীরে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বিদ্রোহীরা মদীনা শরীফে একত্রিত হতে শুরু করলো। সায়্যিদুনা উসমান (রা.) কয়েক দফায় তাদের বিভ্রান্তির সরাসরি জবাব দিলেও সাবায়ীরা তা উপেক্ষা করলো। বহু চেষ্টার শেষে খলীফা (রা.) ও বিদ্রোহীদের মাঝে একটি সুরাহা হলো। যে যার যার এলাকায় চলে যেতে লাগলো। কিন্তু, অনর্থের মূল সাবায়ীরা তা আর হতে দিলো না। তারা মিশরের বিদ্রোহীদের হত্যার নির্দেশসহ সেখানকার গভর্নরের কাছে খলীফার নামে ভুয়া চিঠি পাঠায়। তা আবার বিদ্রোহীদের কাছে ধরা পড়ে। ফিরতি বাকি সকল বিদ্রোহীদের কাছেও এ খবর তীব্র বেগে ছড়িয়ে পড়ে। পুনরায় সবাই একযোগে মদীনা শরীফ অবরোধ করলো।

ভুয়া চিঠির ব্যাপারটা খোলাসা হওয়ার পরও বিদ্রোহের তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকলো। পর্যায়ক্রমে তারা খলীফা উসমান (রা.)-এর জুমুআ পড়ানো বন্ধ করে। অতঃপর তাকে তাঁর ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখে। তাঁর খাবার-পানীয় সব বন্ধ রাখা হয়। হযরত আলী (রা.), উম্মাহাতুল মুমিনীন ও বেশ কয়েকজন সাহাবীর চেষ্টার পরেও তাদের কাছে খাবার-পানীয় পৌঁছানো গেলো না। পাপিষ্ঠরা বরং তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলো। হযরত উসমান (রা.) বিদ্রোহীদের অনর্থক দাবি-দাওয়া মেনে নিলেন না, বরং সত্যের পথে অনড় রইলেন। আবার এদের প্রতিরোধ করতে যেয়ে মুসলমানের রক্তে তাঁর হাত রঞ্জিত হোক, তাও তিনি চাচ্ছিলেন না।

দীর্ঘদিনের অবরোধের পর সে বছর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখে ইসলামের ইতিহাসে এক কলঙ্কের অধ্যায় রচিত হলো; যুন নূরাইন সায়্যিদুনা উসমান (রা.)-কে নির্মমভাবে শহীদ করা হলো। হযরতের শাহাদতের মাধ্যমে ফিতনার দরজা চিরকালের জন্য খুলে গেলো। বিদ্রোহীদের নেতা আশতার নাখয়ীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন- "আল্লাহর কসম! যদি তোমরা আমাকে হত্যা করো, তবে এরপর তোমরা কখনোই আর পরস্পর ভালোবাসতে পারবে না, কখনো একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে না এবং কখনো একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না"। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হযরত উসমান (রা.)-এর এই কথা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

এই ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম জাহানের পরবর্তী খলীফা কে হবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর বিদ্রোহীরা পাঁচদিন মদীনায় অবস্থান করে। খিলাফতের সবচেয়ে উপযুক্ত তিনজন সাহাবী হযরত আলী, হযরত যুবাইর ও হযরত তালহা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম তিনজনকেই বিদ্রোহীরা এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। তাঁরা সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেউ দায়িত্ব না নেওয়ায় বিদ্রোহীরা রেগে তিনজনকেই হত্যার হুমকি-ধামকি দিতে থাকে। ফলে মদীনার অধিবাসী সবাই মিলে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। এতেও আলী (রা.) রাযী হননি। পরবর্তীতে হযরত যুবাইর ও তালহা (রা.)-এর অনুরোধে তিনি রাযী হন এবং তাঁরাই প্রথম তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন।

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পরপরই আলী (রা.)-এর সামনে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছিলো তা হলো–হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার করা। হদ কায়িমের জন্য নির্দিষ্ট দোষী, সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাব, বিষয়টাকে আরো জটিল করে তুলেছিল।

সাধারণতই কোনো অভ্যুত্থান বা গণবিদ্রোহের পরপর রাষ্ট্রীয় কাঠামো স্থিতিশীল হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। বিদ্রোহ চলাকালীন বিশৃঙ্খলার তাৎক্ষণিক বিচার করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ এত বিশাল সংখ্যোক বিদ্রোহীদের মাঝে আপনি কাকে রেখে কাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন? এতে পরিস্থিতি আরো বিপর্যয়কর হয়ে উঠবে, নিরপরাধও ফেঁসে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতেও এ ধরণের অনেক নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া কয়েকটি গণঅভ্যুত্থানও এখানে লক্ষণীয়।

তো, হযরত আলী (রা.) চিন্তা করলেন খলীফা হত্যার কিসাস তো অবশ্যই কায়িম করতে হবে। কিন্তু তা যদি রাষ্ট্রের এমন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে করা হয়, তাহলে অনেক নিরপরাধ মানুষও জান খোয়াবে। কাজেই আগে রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করা প্রয়োজন। চলমান সব সমস্যার সমাধান করে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার করা হবে। তাছাড়া, এমন অনেক বিদ্রোহীরও হদীস পাওয়া যায়, যারা হযরতের হত্যায় শামিল ছিলো না, তারা মূলত সাবায়ীদের চক্রান্তের শিকার। অর্থাৎ তারা সাধারণ বিদ্রোহী হিসেবেই ছিল। বিদ্রোহীদের অনেকেই তাওবা করে হযরত আলী (রা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে। তাই চাইলেই তিনি তখন যাচাই-বাছাই ছাড়া সব বিদ্রোহীদের বিচার করতে পারেন না। ফলে দেরিতেই কল্যাণ।

সাহাবীদের অনেকেই হযরত উসমান (রা.) হত্যার বিচার সংক্রান্ত আলী (রা.)-এর এই ইজতিহাদকে সমর্থন জানান। অপরদিকে, সাহাবীদের প্রবীণ ও উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। যাদের মধ্যে হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আয়িশা ও হযরত মুআবিয়া (রা.) অন্যতম।

হযরত যুবাইর, তালহা ও আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মত ছিলো যে, হযরত আলী (রা.)-এর উচিত যতদ্রুত সম্ভব উসমান (রা.) হত্যার বিচার কার্যকর করা এবং বিদ্রোহী সবার উপরই হদ কায়িম করা। অন্যথায় তাঁরা নিজেরাই কিসাসের জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মাঠে অবতীর্ণ হবেন। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মতও এরকমই ছিল। শুধু পার্থক্য হলো, হযরত আলী (রা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণে হযরত যুবাইর, তালহা, আয়িশা (রা.) এর কোনো অসুবিধা ছিলো না। আর হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শর্ত ছিলো—হযরত আলী (রা.) প্রথমে উসমান (রা.) হত্যার কিসাস কার্যকর করবেন, পরে তিনি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন।

খলীফা হযরত আলী (রা.) ধীরে ধীরে সবদিকের অবস্থা স্বাভাবিক করতে উদ্যত হন। বিদ্রোহীরা খুব দ্রুতই মদীনা থেকে নিজ নিজ জায়গায় চলে যায়। এদিকে হযরত তালহা (রা.)-সহ অনেক সাহাবারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি কিসাস কার্যকরের দাবি জানান। আলী (রা.) তাদেরকে আশ্বস্ত করেন ও ধৈর্য্যধারণের জন্য আহ্বান করেন। সাহাবীদের মধ্যকার এই ইজতিহাদী ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে সাবায়ীরা তাদের নতুন ফন্দি আঁটে। এবার চারিদিকে তারা আলী (রা.) বিরোধী প্রচারণা চালানো শুরু করে। ভাবখানা এমন, যেন হযরত উসমান (রা.) হত্যার পিছনে স্বয়ং আলী (রা.) জড়িত। সাধারণ মানুষ আবার তাদের ফাঁদে পা দিতে শুরু করে। বিশেষত- শামবাসী হযরত উসমান (রা.) হত্যার বিচারের আগে খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

উম্মাহাতুল মুমিনিনরা হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। মদীনায় ফেরার পথে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের খবর তাদের কাছে পৌছায়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তারা মদীনায় ফেরার চেয়ে মক্কায় অবস্থানকে নিরাপদ মনে করে সেখানে ফিরে যান। আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.)-ও তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

ইতোমধ্যে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.) আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর সাথে খলীফা হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে পরামর্শের জন্য মক্কায় একত্রিত হন। তাঁরা তিনজনই আলী (রা.)-এর খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, উক্ত হত্যাকাণ্ডে তাঁর বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি দ্বিমত পোষণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন, এই পাষণ্ডদের বিচারে দেরি করা হলে এটা খুনিদের অন্তরে সাহস যোগাবে, খিলাফতের মসনদের সম্মান অক্ষুণ্ন থাকবে না এবং বাকি খলীফারাও এমন হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারবেন না। যদিও অধিকাংশের ইজমা অনুযায়ী এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সিদ্ধান্তই ছিল হক্বের অধিক নিকটবর্তী।

হারামের আঙিনায় জনসাধারণকে লক্ষ্য করে আম্মাজান আয়িশা (রা.) একটি বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হওয়া খিলাফতের মসনদ, হারাম মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন, মদীনার পবিত্র ভূমিতে সম্মানিত খলীফার ন্যাক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও বিদ্রোহীদের তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য মানুষকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। উপস্থিত মানুষেরা তার ডাকে সাড়া দেয়।

সিদ্ধান্ত হলো, আম্মাজান (রা.), হযরত যুবাইর ও তালহা (রা.)-সহ একটি কাফেলা মক্কা থেকে বসরা ও কূফার দিকে রওয়ানা হবে। সেখানে থাকা মানুষদের সাহায্য নিয়ে উসমানবিরোধী বিদ্রোহীদের থেকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যকার বিবিধ ঝামেলার সুরাহা করা হবে। উসমান (রা.)-এর সময়কার কয়েকজন প্রশাসনিক দায়িত্বশীল সাহাবী তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারাও এ সিদ্ধান্তে একাত্মতা পোষণ করেন। আম্মাজান আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর জন্য উটের উপরে বিশেষ হাওদার ব্যবস্থা করা হয়। আম্মাজানের উটের উপরে সাওয়ার হয়ে সফর পরিচালনার বিরল দৃষ্টান্তের কারণেই পরবর্তী ঘটনাকে "জামাল" বা উটের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

প্রায় ৬০০ জনের একটি কাফেলা মক্কা থেকে বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। আম্মাজান (রা.) এই কাফেলায় শরীক হওয়ার মূল কারণ ছিলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলা। স্পষ্টত কাফেলায় তাঁর উপস্থিতির কারণে দলে দলে মানুষ সংযুক্ত হতে থাকে। বসরায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে যার সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়।

পথিমধ্যে এক জায়গায় আম্মাজান আয়িশা (রা.) কুকুরপালের খুব তীর্যক আওয়াজ শুনতে পান। তিনি সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেন, এ জায়গার নাম কী? তারা বলেন, বাওয়াব। তিনি চমকে ওঠেন! কারণ, কোনো একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "ইশ! আমি যদি জানতে পারতাম তোমাদের থেকে কার জন্য বাওয়াবের কুকুর কান্না করবে"।

স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণীর চাক্ষুষ প্রতিফলনে আয়িশা (রা.) কিছুটা চমকে যান। ঘটনা এতটুকুই। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে ফিরে যাওয়া বা ইতস্তত হওয়ার বর্ণনাগুলো অধিকাংশই বানোয়াট।

কাফেলা বসরা সীমান্তে পৌঁছালে শহরের অদূরে একটি স্থানে শিবির স্থাপন করা হয়। এখান থেকেই আম্মাজান (রা.) বসরার গণ্যমান্য লোকজনের সাথে যোগাযোগ করেন, তাদেরকে তাঁর বসরা আসার সকল উদ্দেশ্যও জানান।

উসমান ইবনু হুনাইফ (রা.) তখন বসরার গভর্নর। তিনি হযরত আয়িশা (রা.)-এর সাথে দেখা করতে শিবিরে পৌঁছান। আম্মাজান সাফ জানিয়ে দেন, এত দূর সফর করার পেছনে তাঁর কোন গোপন উদ্দেশ্য নেই, এসবই মূলত উম্মাহের মধ্যকার সমস্যার সমাধানের অভিপ্রায়ে। হযরত তালহা ও যুবাইরও জানান যে, হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

এদিকে বসরার মানুষরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল মক্কা থেকে আসা কাফেলায় শামিল হয়। বিশেষত আম্মাজান (রা.) ও প্রবীণ বিশিষ্ট সাহাবীগণের উপস্থিতি মানুষকে এই কাফেলায় যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরদিকে বসরায় ঘাপটি মেরে থাকা সাবায়ীরা নিজেদেরকে আলী (রা.)-এর কল্যাণকামী দাবী করে, মানুষকে এই কাফেলার বিরুদ্ধে ফুসলিয়ে তুলে। যার নেতৃত্ব দেয়, হুকাইম ইবন জাবালা। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পেছনেও এই পাপিষ্ঠের হাত ছিল।

সাবায়ী হুকাইমের প্ররোচনার ফলে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মক্কার কাফেলা ও বসরা প্রশাসনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মধ্যেই এরা কাফেলায় আক্রমণ করে বসে। আত্মরক্ষার্থে কাফেলায় থাকা মানুষেরাও প্রতিঘাত করতে শুরু করেন। তীব্র যুদ্ধের শেষে বিদ্রোহীরা পরাভূত হয়। হুকাইমসহ বসরার নেতৃস্থানীয় সাবায়ীরা এতে মারা যায়। সিদ্ধান্ত হয় বসরায় থাকা সাবায়ী বিদ্রোহীদের উপর হদ কায়িম হবে। ফলে, বসরায় লুকিয়ে থাকা সাবায়ী মুনাফিকরা নির্মূল হয়।

এদিকে হযরত আলী (রা.) মদীনা থেকে কূফায় আগমন করেন। কূফাবাসী তাকে সাদরে বরণ করে এবং সরাসরি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। অতঃপর আলী (রা.) চিন্তা করলেন মক্কার কাফেলার সাথে ভালোভাবে বোঝাপড়ার জন্য কাউকে প্রেরণ করা প্রয়োজন। তিনি কা'কা ইবন আমর (রা.)-কে এ কাজের জন্য প্রেরণ করেন। এসময় কা'কা নিখুঁত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমে হযরত আয়িশা (রা.)-এর সাথে দেখা করে তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চান। আম্মাজান সাধারণভাবেই সব বলেন। তখন কা'কা তাঁর সামনে পরিস্থিতির জটিলতা ভালোভাবে তুলে ধরেন। তিনি বসরার উদাহরণ টেনে আনেন। সেখানে বিদ্রোহীদের উপর হদ কায়িম হলেও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়নি। একই কাজ পুরো ইসলামী রাষ্ট্র জুড়ে করতে গেলে উপরন্তু তা গৃহযুদ্ধের রূপ নিবে। কা'কার কথা উম্মুল মুমিনীন উপলব্ধি করতে পারলেন। হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-ও সায় দিলেন। সুরাহা হলো–পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত কিসাস সম্পাদন থেকে বিরত থাকা হবে।

এ খবর কূফায় হযরত আলী (রা.)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বসরায় আগমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। মালউন আবদুল্লাহ ইবন সাবা ও সাবায়ীদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তখন কূফায় অবস্থান করছিল। তারা টের পেলো, তাদের আর রক্ষা নেই। কারণ মক্কার কাফেলা ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে আজ হোক কিংবা কাল, তাদের পরিণতিও বসরার সাবায়ীদের মতো হবে। তাই তারা নতুন চক্রান্তের ছক আঁকতে লাগলো। চিরায়তভাবেই তারা দুই দলের ভিতরে ভাগ হয়ে ফিতনা সৃষ্টির পাঁয়তারা করে।

কা'কা ইবন আমর (রা.)-এর মাধ্যমে উভয় দল সমঝোতায় আসলেও কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদিত হয়নি তখনো। তাই হযরত আলী (রা.) বসরায় পৌঁছেই মক্কার বাহিনীর শিবিরের মুখোমুখি হন। উভয় শিবিরের মানুষেরাই একে অন্যের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। কারণ সবাই তো একে অপরের পূর্বপরিচিত, একসাথেই তাদের চলাফেরা। তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো সমস্যা বিদ্যমান ছিল না।

এদিকে ঝামেলার নিষ্পত্তিকল্পে হযরত আলী (রা.) হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর সাথে কয়েক দফায় আলোচনায় বসেন। এসময় তারা আলী (রা.)-এর খিলাফতে অসন্তুষ্ট কি-না, সেটাও জেনে নিতে চাইলেন। উভয়ের কারোরই আলী (রা.)-এর খিলাফতে কোন অসন্তোষ ছিলো না। তাছাড়াও উভয় বাহিনীর মধ্যে কোন যুদ্ধ না বাঁধিয়ে পরামর্শের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথচ শান্তিপূর্ণ এ অবস্থায় তাদের অজান্তেই সাবায়ীরা নীলনকশা সাজাচ্ছিল।

১০ জমাদিউল আখির, ৩৬ হিজরী সন। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা সাবয়ীরা কাজে নেমে পড়লো। উভয় শিবিরে ঘাপটি মেরে থাকা তাদের সদস্যরা একে অন্যের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পর তারা বিপরীত শিবিরকে লক্ষ্য করে তির ছুঁড়তে শুরু করে। কিছু বোঝার আগেই শুরু হয়ে যায় তুমুল লড়াই। অথচ, উভয় শিবিরের নেতৃস্থানীয় জায়গা থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন আদেশই আসেনি। এরপর সাবায়ীরা উভয় দিকের নেতাদের কাছেও বিপরীত দলের সম্পর্কে ভুয়া খবর পৌঁছাতে থাকে। আলী (রা.) যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েও সফল হননি। অনেক অপেক্ষার পর দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয়রা যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধ্য হন। পুরোদমে শুরু হয় যুদ্ধ।

হযরত তালহা (রা.) চেষ্টা করছিলেন যুদ্ধ বন্ধ করার। যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন উড়ো একটি তির এসে বিদ্ধ হয় তার দেহে। এই তির মারওয়ান ইবন হাকাম ছুড়েছিল মর্মেও সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর যখম এত গভীর ছিলো যে, রক্তক্ষরণের কারণেই তিনি শাহাদতবরণ করেন।

যুদ্ধের তীব্রতা দেখে হযরত যুবাইর (রা.) আগেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মদীনার দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু আমর ইবন জুরমুয নামক সাবায়ী এক পাপিষ্ঠ তাঁর পিছু নেয় এবং পথিমধ্যে তাঁকে হত্যা করে। হযরত আলী (রা.) আগেই যুবাইর (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর (রা.)-কে বলেছিলেন, "একদিন তুমি ও আলী মুখোমুখি হবে, সেদিন তুমি তাঁর উপর যালিম হবে"। এটা মনে পড়তেই যুবাইর (রা.) এ যুদ্ধে না জড়ানোর জন্য মনস্থির করে ফেলেন। তবে, যেহেতু তখন যুদ্ধের কোন পরিস্থিতিই ছিলো না, তাই উম্মাহের মাঝে সুলাহার জন্য তিনি শিবিরেই রয়ে যান।

উম্মুল মুমিনীন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধের খবর পেয়ে তিনি ময়দানে ছুটে যান। তাঁকে দেখে যদি অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, এই ছিলো আশা। তিনি ময়দানে আসতেই সাবায়ীরা তাঁর হাওদা লক্ষ্য করে তির চালানোর দুঃসাহস দেখায়। আম্মাজান আয়িশা (রা.) নিজের জানের পরোয়া না করে বারবার যুদ্ধ বন্ধের জন্যক আহ্বান করছিলেন। কে শুনে কার কথা! এদিকে আম্মাজানের উটকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের তীব্রতা

আরো বেড়ে যায়। অনেকেই তাঁর নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। আহতও হন আরো বেশ কয়েকজন।

এদিকে হযরত আলী (রা.) কীভাবে এ যুদ্ধ থামানো যায় এর কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিভীষিকাময় এ অবস্থায় কা'কা ইবন আমর পরামর্শ দেন যে, এখন যুদ্ধ যেহেতু আম্মাজানের উটকে কেন্দ্র করে চলছে তাই উটটাকে বসিয়ে দিতে পারলে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আয়িশা (রা.)-এর উটকে বসিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর হাওদাকে সসম্মানে আলী (রা.)-এর সামনে আনা হয়।

হযরত আলী (রা.) পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কাছে যান, বলেন–আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন। আম্মাজান (রা.)-ও একই রকম দুআ করেন। ইতি ঘটে আমাদের ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধের। মালউন, ফিতনাবাজ সাবায়ীদের চক্রান্তে সংঘটিত হওয়া এই মর্মান্তিক যুদ্ধে ৩ হাজার, মতান্তরে ১০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান।

মাওলা আলী (রা.) আবার অবস্থা স্বাভাবিক করার দিকে মনোযোগ দেন। বিপরীত দলের থেকে প্রাপ্ত সব মালামালকে গনীমত ধরা হবে না। এক জায়গায় জমা করা হবে এবং যার যার জিনিস সে প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবে। কারোর প্রতিই তিনি অবিচার করতে চাইলেন না। নিহত এদিকের হোন কিংবা ওদিকের, সবাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলো। এমনকি তাদের জানাযাও তিনি পড়ালেন।

আম্মাজান আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বসরার একটি বিশেষ বাড়িতে সসম্মানে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটালে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হলো। কয়েকদিন বসরায় অবস্থান করে তিনি মদীনার দিকে রওয়ানা হন। সম্মানার্থে বসরার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর থেকে ৪০ জন নারীকে তাঁর সাথে দেওয়া হলো। যাওয়ার আগে তিনি জনসাধারণকে লক্ষ্যে করে বলেন, "তোমরা নিজেদের মাঝে অভিমান পুষে রেখো না। আল্লাহর কসম, অতীতে আমার আর আলী (রা.)-এর মাঝে যা কিছু হয়েছিল, তা কেবল একজন নারীর ও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সম্পর্কের মতোই; এর বেশি কিছু নয়। (অর্থাৎ, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সাথে মহিলাদের সাধারণ মনোমালিন্য যেমন স্বাভাবিক, হযরত আলী ও আয়িশা (রা.)-এর মধ্যকার ছোটখাটো বিষয়গুলোও ছিলো তেমন স্বাভাবিক) তিনি নিশ্চিতভাবেই আমার দৃষ্টিতে নেককারদের একজন"। হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এ বক্তব্য পৌঁছালে তিনি বললেন–অবশ্যই তিনি সত্য বলেছেন, আর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইহকাল-পরকাল উভয়কালের স্ত্রী।

আম্মাজান (রা.) তাঁর বাকি জীবনে এ যুদ্ধের কথা মনে করে আফসোস করতেন। তাবারীর এক বর্ণনানুযায়ী, জামালের যুদ্ধের কথা মনে করলেই তিনি বলতেন, "হায়! আমি যদি এ ঘটনার বিশ বছর আগে মারা যেতাম"। তিনি এত বেশি কান্না করতেন যে, তাঁর ওড়না চোখের পানিতে ভিজে যেত। আলী (রা.)-ও এ যুদ্ধের জন্য অনেক আফসোস করতেন।

দেখুন, জামালের যুদ্ধ পুরোটাই অনিচ্ছাকৃত। দুই পক্ষের কেউই চাননি এই যুদ্ধ সংঘটিত হোক। আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের মূল ইখতিলাফ ছিল ফিকহী। এটা এমন একটা বিষয় নিয়ে ছিলো যার আর কোনো নিদর্শন বিদ্যমান ছিলো না। তাই সাহাবীরা তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী মতামত পোষণ করেন। এজন্য এক্ষেত্রে কাউকেই দোষারোপ করা যাবে না। তবে উম্মাহের ইজমা হয়েছে এর উপর যে, হযরত উসমান হত্যার বিচারকার্যের বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদই সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক ছিল। তাছাড়া, হযরত আয়িশা (রা.), তালহা ও যুবাইর (রা.) কেউই যুদ্ধের নিয়তে বসরার দিকে রওয়ানা হননি। আলী (রা.)-এর খিলাফত নিয়েও তাদের কোনো অসুবিধা ছিলো না। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, সাধারণ জনগণের সাহায্য নিয়ে হযরত উসমান (রা.) হত্যার বিচার করা। যাতে বিদ্যমান বাকি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু পাপাচারী সাবায়ীদের চক্রান্তে তা অন্যদিকে রূপ নেয়।

মনে রাখতে হবে, জঙ্গে জামালের এই ঘটনা মুশাজারাতে সাহাবার অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীদের মধ্যকার বিভিন্ন ইখতিলাফের ঘটনার জন্য আদব রক্ষার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ এই পরিভাষা ব্যবহার করেন। "মুশাজারাহ" এর অর্থ হলো–গাছের এক ডালের সাথে অন্য ডালের সংঘর্ষ হওয়া। বাতাসের কারণে গাছের শাখা-প্রশাখার সংঘর্ষ হওয়াটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি ইজতিহাদের কারণে সাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত হওয়া বিষয়াদিও স্বাভাবিক ছিল। ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন- "আমরা সাহাবীদের মধ্যে ঘটা মুশাজারাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করবো না। তারা সকলেই আমাদের ইমাম। আমরা উত্তমভাবে তাদের আলোচনা করবো"। (তাফসীরে কুরতুবী- ৩২১/১৬) কিন্তু ইসলামের ওই সময়কাল থেকেই রাফিজী, নাসিবীসহ ইত্যাদি ভ্রান্ত দলের উৎপত্তি হয়। ফলে, মুশাজারাতের ঘটনাগুলো নিয়ে ভুরি-ভুরি মিথ্যা, ভুয়া ও বানোয়াট ইতিহাস রচিত হয়। যেখানে কেউ কেউ উম্মাহাতুল মুমিনীন-সহ জলীলুল কদর সাহাবীদের মান ক্ষুণ্ন করে মনগড়া ইতিহাস বানিয়েছে। কেউ কেউ তা ভরে রেখেছে আহলে বাইতের বিদ্বেষ দিয়ে। যার পরিণাম আজও আমাদের সয়ে যেতে হচ্ছে। এসব অনির্ভরযোগ্য ইতিহাসের উপর ভর করে প্রাচ্যবিদরা আজ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের পবিত্র চরিত্র কলঙ্কিত করার মাধ্যমে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এজন্য সাহাবীদের সম্পর্কে আগে আমাদের আকীদা ঠিক করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রিয় সাহাবারা সবাই মাগফূর। তারা মাসুম নন, তবে মাহফুয। আমরা তাদের সকলকে ভালোবাসি এবং তাদের সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু বলি না। ইমাম আবূ জাফর তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা আসহাবে রাসূলকে ভালোবাসবো। তাঁদের কারও মহব্বতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবো না, তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবো না। যারা তাদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাদেরকে ঘৃণা করবো। শুধু তাদের ভালোদিকগুলোই আলোচনা করবো। তাদেরকে মহব্বত করা দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের অংশ; তাদেরকে ঘৃণা করা হলো কুফরী, মুনাফিকী ও অবাধ্যতা। (শরহে আকীদাতুত তাহাবী-বাবিরতী- ১২৭/১২৮)

যখন কোনো একটি বিষয়ে একজনের আকীদা সঠিক হয়ে যায় তখন তার আকীদাটি অন্য সব বাতিল মত-পথকে পার্থক্য করার কাজ করে। ইতিহাস আমাদের জানা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু ইতিহাস জানার পথ বেশ কন্টকাকীর্ণ। এখানে প্রতিটি পদে পদে ফাঁদ পাতা থাকে। তাই যেই ইতিহাস-কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমালব্দ আকীদার বিরোধী হবে তা সরাসরি পরিত্যাজ্য।



ফরয গোসলের মাসাইল

ড. মো: মুহিবুর রহমান

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামের অন্যতম সুন্দর দিক। অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গোসল শব্দটি ধৌত করা এবং পরিচ্ছন্নতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীআতের পরিভাষায় গোসল হলো নির্দিষ্ট শর্ত ও রুকন মেনে বিশেষ উপায়ে সমস্ত শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করা। গোসল প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত, যথা: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। এই প্রবন্ধে গোসল ফরয হওয়ার কারণ এবং গোসল ফরয অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসাইল বর্ণনা করা হবে।

গোসল ফরয হওয়ার কারণ

গোসল ফরয হওয়ার কারণ তিনটি। যথা:

গোসল ফরয হওয়ার প্রথম কারণ: জানাবাত

জানাবাত বলতে অপবিত্র অবস্থাকে বুঝানো হয়। আর অপবিত্র অবস্থায় থাকা ব্যক্তিকে বলা হয় জুনুব। যে ব্যক্তির মনী নির্গত (বীর্যপাত) হয়েছে, তাকে জুনুব বলা হয়; আর হাদীসে এমন ব্যক্তিকেও জুনুব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে, যদিও বীর্যপাত না হয়ে থাকে। জানাবাতের কারণে গোসল করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

-হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার; এবং জুনুব (অপবিত্র) অবস্থায়ও নয়, পথ অতিক্রমকারী ব্যতীত, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করো।[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

-আর তোমরা যদি অপবিত্র (জুনুব) হও, তবে পবিত্রতা অর্জন করো।[২]

জানাবাত মূলত দুইভাবে সাব্যস্ত হয়। যথা:

ক. সহবাস ব্যতীত সবেগে বীর্যপাত হওয়া

সহবাস ব্যতীত কেবল স্পর্শ, দৃষ্টিপাত, স্বপ্নদোষ কিংবা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে কামভাবসহ সজোরে মনী নির্গত হলে গোসল ফরয হয়। ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায় পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য।[৩]

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ -পানি তো কেবল পানির কারণেই।[৪] অর্থাৎ সজোরে নির্গত পানি নির্গমনের কারণেই পানি দ্বারা গোসল করা ফরয হয়, আর তা হলো মনী।

উম্মু সুলাইম (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

-হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেন না, কোনো নারী যদি স্বপ্নদোষগ্রস্ত হয়, তবে কি তার ওপর গোসল ফরয হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যখন সে পানি দেখতে পাবে।[৫]

খ. সহবাস করা

যৌনাঙ্গ পথে পুরুষলিঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হওয়ার পরিমাণ প্রবেশ করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক, সঙ্গমকারী ও সঙ্গমকৃত উভয়ের ওপরই গোসল ফরয হয়ে যায়।[৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

-যখন পুরুষ নারীর চার শাখার মাঝে বসবে এবং খাতনাস্থল খাতনাস্থলকে স্পর্শ করবে, তখন গোসল ফরয হয়ে যাবে।[৭] অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

-যখন খাতনাস্থল খাতনাস্থলকে অতিক্রম করবে, তখন গোসল ফরয হয়ে যাবে।[৮]

জানাবাত সম্পর্কিত অন্যান্য মাসআলা

বীর্যপাতের মাধ্যমে জানাবাত সাব্যস্ত হতে হলে মনী নির্গমন কামভাবসহ হতে হবে। সুতরাং যদি আঘাত লাগা, কোনো ভারী বস্তু বহন করা, অসুস্থতা কিংবা এই জাতীয় অন্য কোনো কারণে মনী নির্গত হয়, তবে গোসল ফরয হবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জুনুব বলেও গণ্য হবে না; কারণ অভিধানে জানাবাত বলতে কামভাব সহকারে মনী নির্গত হওয়াকে বোঝায়।[৯] আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রচুর মযী নির্গত হওয়া এক ব্যক্তি ছিলাম, ফলে আমি নবী ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ

-যখন তুমি মযী দেখতে পাবে, তখন উযূ করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, আর যখন সবেগে পানি নির্গত হতে দেখবে, তখন গোসল করবে।[১০] আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কামভাব ব্যতীত সবেগে বীর্য নির্গত হয় না।

জানাবাত ধর্তব্য হওয়ার জন্য যৌনাঙ্গ থেকে শরীরের বাইরের অংশে মনী নির্গত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং মনী যদি পুরুষাঙ্গের নালীতে কিংবা যোনীর ভেতরের অংশে থেকে যায়, তবে গোসল ফরয হবে না।[১১]

যৌনাঙ্গ থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত কামভাব অবিরত থাকা শর্ত নয়, কেবল ইমাম আবূ ইউসূফ-এর মত ব্যতীত। সুতরাং

স্বপ্নদোষগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কামভাব শান্ত হওয়া পর্যন্ত হাত দিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে রাখে, অতঃপর কামভাব শান্ত হওয়ার পর মনী নির্গত হয়, তবে সে জুনুবী হয়ে যাবে এবং তার ওপর গোসল ফরয হবে।[১২]

কোনো ব্যক্তি যদি পেশাব করার, ঘুমানোর কিংবা কয়েক কদম হাঁটার পূর্বে জানাবাতের গোসল করে ফেলে, অতঃপর তার শরীর থেকে অবশিষ্ট মনী গড়িয়ে পড়ে, তবে তার ওপর পুনরায় গোসল করা আবশ্যক হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি পেশাব করার, ঘুমানোর কিংবা অনেক হাঁটার পর জানাবাতের গোসল করে, অতঃপর তার শরীর থেকে মনী গড়িয়ে পড়ে, তবে তার ওপর পুনরায় গোসল করা আবশ্যক হবে না। কারণ ঘুম, পেশাব এবং প্রচুর হাঁটা সাধারণত কামভাবের সাথে স্বস্থানচ্যুত হওয়া মনীর প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে দ্বিতীয়বার যা নির্গত হয়, তা কামভাব ছাড়াই স্বস্থানচ্যুত হয়, তাই গোসল আবশ্যক হয় না।[১৩] তবে বিশেষ জরুরি অবস্থা ও মজবুরী ক্ষেত্রে, ইমাম আবূ ইউসূফ-এর মতানুসারে এসব অবস্থায় গোসল ফরয না হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া হয়।[১৪]

আর কোনো নারী যদি গোসল করে ফেলে, অতঃপর তার মধ্য থেকে স্বামীর মনী নির্গত হয়, তবে তার ওপর দ্বিতীয়বার গোসল করা ফরয নয়।[১৫]

কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল, অতঃপর জেগে ওঠার পর সে তার কাপড়ে ভিজা ভাব দেখতে পেল, চাই তার স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকুক কিংবা মনে না থাকুক, তার ওপর গোসল ফরয হবে। কারণ ভিজা ভাব বিদ্যমান থাকা হলো স্বপ্নদোষ সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ, আর ঘুম হলো অসচেতনতা ও অচেতনতার অবস্থা, যাতে এমন সব বিষয় ঘটে, যা ঘুমন্ত ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না। আর এ কথা বলা যাবে না যে, ভিজা ভাবটি হয়তো মযী কিংবা ওয়াদী হতে পারে; কারণ উষ্ণতা ও বাতাসের প্রভাবে মনী পাতলা হয়ে যায় এবং মযীর মতো রূপ ধারণ করে।[১৬] আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

-রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ভিজা ভাব দেখতে পায় কিন্তু তার স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে গোসল করবে।" এবং এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে মনে করে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু সে কোনো ভিজা ভাব দেখতে পায় না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তার ওপর গোসল ফরয নয়।" তখন উম্মু সুলাইম (রা.) বললেন, নারী যদি এমন দেখতে পায়, তবে কি তার ওপর গোসল আবশ্যক? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হ্যাঁ, নারীরা তো পুরুষদেরই সদৃশ।"[১৭]

যদি বিছানায় বীর্য পাওয়া যায়, এবং স্বামী বলে যে এটা স্ত্রীর, আর স্ত্রী বলে যে এটা স্বামীর, সতর্কতা হিসেবে তাদের উভয়ের ওপরই গোসল ফরয হবে।[১৮]

নেশাগ্রস্ততা কিংবা অচেতন অবস্থা থেকে চেতনা ফিরে পাওয়ার পর কেউ যদি এমন কোনো ভিজা ভাব দেখতে পায় যাকে সে বীর্য বলে ধারণা করে, তবে তার ওপর গোসল ফরয হবে।[১৯]

মৃতদেহের কিংবা পশুর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট করানোর ফলে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হবে, বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হবে না।[২০]

ফকীহগণের কেউ কেউ অভিমত দিয়েছেন যে, নারী যদি যৌনতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে তার সম্মুখদ্বারে আঙুলের মতো কোনো বস্তু প্রবেশ করায়, তবে কামভাবের আধিক্য ও বীর্যপাতের প্রবল সম্ভাবনার কারণে তার ওপর গোসল ফরয হবে। আর এই সকল অবস্থার যেকোনোটিতেই যদি বীর্যপাত ঘটে, তবে তার ওপর গোসল ফরয হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[২১]

গোসল ফরয হওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ: হায়েয ও নিফাস

গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহের অন্যতম হলো হায়েয ও নিফাস সমাপ্ত হওয়া। হায়েয বন্ধ হলে গোসল ফরয হওয়ার মূল প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

-আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা 'কষ্ট'। কাজেই তোমরা হায়েযের সময় স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না।[২২] এখানে "পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত" অর্থ: যতক্ষণ না তারা গোসল করে।[২৩] তারা যতক্ষণ না গোসল করে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে; আর গোসল আবশ্যক না হলে তা নিষিদ্ধ করা হতো না।

হায়িযের দিনগুলো পূর্ণ করার পর গোসল ফরয হওয়ার বিষয়টি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

-ফাতিমা বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত থাকি, তাই পবিত্র হতে পারি না; সুতরাং আমি কি সালাত পরিত্যাগ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, না, এটি তো একটি রোগ মাত্র; বরং তোমার হায়েযের দিনগুলোর সমপরিমাণ সময় সালাত ত্যাগ করো, তারপর গোসল করো এবং সালাত আদায় করো।[২৪]

মুস্তাহাযা নারী যখন তার হায়েযের দিনগুলো পূর্ণ করবে, তখন তার ওপর গোসল আবশ্যক হবে; কারণ হায়েযের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে সে পবিত্র নারীদের ন্যায়।[২৫]

নিফাস বন্ধ হলে গোসল ফরয হওয়া ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত। এ বিষয়ে সরাসরি কোনো স্পষ্ট নস নেই।[২৬]

কোনো নারী যদি সন্তান প্রসব করে এবং রক্ত না দেখে, তবে সঠিক মত হলো, তার ওপর গোসল ফরয হবে।[২৭]

গোসল ফরয অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসাইল

কারো উপর গোসল ফরয হলে যত দ্রুত সম্ভব গোসল করে পবিত্র হওয়া উত্তম। দীর্ঘ সময় অপবিত্র অবস্থায় থাকার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ

-যে ঘরে কোনো ছবি, কুকুর অথবা অপবিত্র ব্যক্তি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।[২৮]

তবে কোনো অপবিত্র ব্যক্তি যদি নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত গোসল করতে বিলম্ব করে, তবে সে গুনাহগার হবে না।[২৯] কেননা জুনুব ব্যক্তি, ঋতুমতী নারী ও নিফাসগ্রস্ত নারীর ওপর গোসল করে নেওয়া আবশ্যক হয় না, যে পর্যন্ত না নামায আদায় করা আবশ্যক হয় কিংবা এমন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করা হয়, যা গোসল করা ছাড়া বৈধ হয় না; যেমন

নামায, তিলাওয়াতের সিজদাহ, কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি।[৩০]

গোসল ফরয অবস্থায় কোনো ব্যক্তির জন্য উযূ করার পূর্বে ঘুমানো এবং পুনরায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই; তবে উযূ করে নেওয়া উত্তম। আর পানাহার করতে চাইলে কুলি করা এবং দুই হাত ধুয়ে নেওয়া উচিত।[৩১]

গোসল ফরয অবস্থায় গিলাফ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা, কুরআন সংবলিত মুদ্রা স্পর্শ করা জায়িয নয়।[৩২] যেকোনো কিছুতে যদি কুরআনের আয়াত লিখিত থাকে, তাতে স্পর্শ করাও জায়েয নেই।

এরকম অবস্থায় তিলাওয়াতের নিয়তে কুরআন পাঠ করা হারাম, এমনকি তা এক আয়াতের চেয়ে কম হলেও। সুতরাং যে ব্যক্তি দু'আ, আল্লাহর প্রশংসা, কোনো কাজের সূচনা কিংবা শিক্ষার উদ্দেশ্য করে, এবং এক শব্দ এক শব্দ করে শিক্ষা দেয়, তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তা হালাল হবে।[৩৩] নবী ﷺ বলেছেন,

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

-ঋতুবর্তী নারী এবং জুনুব ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশই পাঠ করবে না।[৩৪] কোনো শিক্ষিকা ঋতুবর্তী হলে, তার জন্য উচিত হবে শিশুদেরকে একটি একটি শব্দ করে শিক্ষা দেওয়া এবং দুটি শব্দের মাঝে বিরতি দেওয়া।[৩৫]

গোসল ফরয অবস্থায় কুরআনের কোনো আয়াতের অনুবাদে স্পর্শ করা মাকরূহ।[৩৬] তাফসীর, ফিকহ ও হাদীসের গ্রন্থসমূহ স্পর্শ করা মাকরূহ, যেহেতু এ গ্রন্থগুলো কুরআনের আয়াত থেকে মুক্ত নয়। এসব গ্রন্থের যে অংশে কুরআনের আয়াত লিখিত রয়েছে, সেই স্থানটুকু স্পর্শ করা জায়িয নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের আয়াত ব্যতীত অন্য অংশ স্পর্শ করতে চান, তবে তার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মূল মুসহাফের বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা মুসহাফের অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই কুরআনের অনুগামী।[৩৭] তাই মুসহাফের কোনো অংশই স্পর্শ করা জায়িয নয়।

তবে মুসহাফ থেকে পৃথক কোনো গিলাফ বা কভার, যেমন: থলি কিংবা বাঁধাই না করা পৃথক চামড়া দিয়ে তা স্পর্শ করা জায়িয রয়েছে। কিন্তু যা মুসহাফের সাথে সরাসরি সংযুক্ত বা বাঁধাই করা, তা দিয়ে স্পর্শ করা জায়িয নয়।[৩৮] শরীরে পরিহিত পোশাকের কিছু অংশ দিয়ে কুরআন স্পর্শ করা জায়িয নয়।[৩৯]

গোসল ফরয অবস্থায় কোনো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

-আমি কোনো কোনো ঋতুমতী নারী এবং অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদ বৈধ করছি না।[৪০] যখন মসজিদে প্রবেশ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন প্রবেশ করা যাবে।[৪১]

আর যদি মসজিদে থাকাকালীন কারো স্বপ্নদোষ ঘটে, তবে সে যদি দ্রুত বের হয়ে যায়, তবে মুস্তাহাব হিসেবে তায়াম্মুম করবে; আর সে যদি কোনো ভয়ের কারণে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করে, তবে ওয়াজিব হিসেবে তায়াম্মুম করবে।[৪২] যে ব্যক্তির দরজা মসজিদের দিকে এবং সে জুনুব অবস্থায় মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তার ওপর তায়াম্মুম করা ওয়াজিব।[৪৩]

জুনুব ব্যক্তি, ঋতুমতী নারী ও নিফাসগ্রস্ত নারীর জন্য ঈদগাহে অথবা মাদরাসায় যাওয়ায় অসুবিধা নেই।[৪৪]

গোসল ফরয অবস্থায় কাবাঘর তাওয়াফ করা হারাম।[৪৫]

আর জুনুব ব্যক্তির আযান দেওয়া মাকরূহ তাহরীমী।[৪৬] এরকম ব্যক্তির আযান পুনরায় দিতে হবে।[৪৭] তবে তাদের জন্য আযানের জবাব দেওয়া, বিভিন্ন দুআ পাঠ করা জায়িয; এমনকি দুআয়ে কুনূত পাঠ করাও মাকরূহ নয়।[৪৮]

পবিত্রতা অর্জন করা ইবাদত কবূল হওয়ার প্রধান শর্ত। তা পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসাইল জেনে পবিত্র হওয়া জরুরি। ফরয গোসল সংক্রান্ত মাসাইল জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

---

১. সূরা আন-নিসা: ৪৩।
২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৬।
৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৪।
৪. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস: ৩৪৩।
৫. বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, হাদীস: ১৩০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস: ৩১৩।
৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৫।
৭. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস: ৩৪৯।
৮. তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস: ১০৯। হাদীসটি হাসান সহীহ।
৯. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ৩৭; আব্দুল হামীদ মাহমূদ তাহমায, আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০১।
১০. নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস: ১৯৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস: ১০২৮। হাদীসটি সহীহ।
১১. আব্দুল হামীদ মাহমূদ তাহমায, আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০২।
১২. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৪।
১৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৪; আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০২।
১৪. আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০২।
১৫. আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০২।
১৬. আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০২।
১৭. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস: ২৩৬; তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস: ১১৩। হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।
১৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৫।
১৯. আশ-শুরুম্বুলালী, নূরুল ঈযাহ, পৃ. ২৭।
২০. ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক, খ. ১, পৃ. ৬১।
২১. আব্দুল হামীদ মাহমূদ তাহমায, আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ১০৩-১০৪।
২২. সূরা আল-বাকারা: ২২২।
২৩. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ৩৮; আল-মাওসিলী, আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার, খ. ১, পৃ. ১২।
২৪. বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, হাদীস: ৩২৫।
২৫. আল-মাওসিলী, আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার, খ. ১, পৃ. ১২।
২৬. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ৩৮; আল-মাওসিলী, আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার, খ. ১, পৃ. ১২।
২৭. ইবনু 'আবিদীন, রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ১৬৮।; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৬।
২৮. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস: ২২৭। হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।
২৯. বুরহানুদ্দীন আল-বুখারী, আল-মুহীতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৮৭।
৩০. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রায়িক, খ. ১, পৃ. ৬৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৬।
৩১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৬।
৩২. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ৩৭।
৩৩. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ২৯।
৩৪. তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস: ১৩১। হাদীসটি দ'য়ীফ।
৩৫. বুরহানুদ্দীন আল-বুখারী, আল-মুহীতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ২১৭।
৩৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৯।
৩৭. ইবনু আবিদীন, রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ১৭৬।
৩৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৮।
৩৯. ইবনু 'আবিদীন, রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ১৭৪।
৪০. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস: ২৩২। হাদীসটি হাসান।
৪১. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ২৯।
৪২. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ২৯; আল-মাওসিলী, আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার, খ. ১, পৃ. ১৩।
৪৩. ইবনু 'আবিদীন, রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ১৭২।
৪৪. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ২৯।
৪৫. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ২৯।
৪৬. ইবনু 'আবিদীন, রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ৩৯২; আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ২৯।
৪৭. আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ৫৬।
৪৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৮।



কবি আবদুল মুকীত চৌধুরী-এর

সাক্ষাৎকার

বিশিষ্ট কবি, গবেষক, সাংবাদিক আবদুল মুকীত চৌধুরীর সাহিত্যে রয়েছে কাব্য, কাব্যানুবাদ, কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ও কবিতা এবং জাতীয় কবি রূপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে উপস্থাপনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে গ্রন্থাবলি সম্পাদনা, শিশু সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, অনুবাদ-কর্ম সম্পাদনা এবং বাংলাদেশ বেতারে দীর্ঘকালীন সংশ্লিষ্টতায় অবদান। আল্লাহ তাআলা, সায়্যিদুল মুরসালীন প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.), ইসলামের কল্যাণ ও শান্তি-বার্তা বিষয়ে তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ। মহানবী (সা.) প্রসঙ্গে আন্তজার্তিক পর্যায়ের গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদনা ও হযরত আলী (রা.)-এর দীওয়ানের কাব্যানুবাদ ও অনুদিত বাংলা 'নাহযুল বালাগাহ পরিচিতি সম্পাদনা করেছেন তিনি। বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচনের শব্দ-ভূষিত অনন্য কাব্যকলায় পথিকৃৎ কবি বাংলা অভিধান ঘেটে স্বর-অ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাসঙ্গিক কাব্যের সূচনাও করেছেন। কথাশিল্পী চিন্তাবিদ অধ্যাপক শাহেদ আলী ও ভাষাসৈনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবদুল গফুরের সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা ত্রৈমাসিকে সম্পাদনায় উজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন তিনি। রাসূল (সা) সম্পর্কে অনুসারী উম্মাহর কোনো কোনো সদস্যের লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে অসাবধানী শব্দ নির্বাচনের বিপরীতে কাব্যে ও প্রবন্ধে তার অবস্থান। তাঁর কলম নিবেদিত স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য। দেশে-বিদেশে বহু সংবর্ধনা-সম্মাননা পদক-পুরস্কারে ভূষিত কবির বয়স ৮৪ চলছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত তার এ সাক্ষাৎকার পরওয়ানা'র সত্যসন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য জাতীয় জীবনে উজ্জীবন-উত্তরণ চিন্তার সহায়ক হতে পারে। -সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পরওয়ানা: আপনার 'বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাহ' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলুন।

আবদুল মুকীত চৌধুরী: 'বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাহ' গ্রন্থের প্রকাশক লতিফিয়া ফাউন্ডেশন, ফুলতলী ভবন, নয়াপল্টন, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১০ মুহররম (আশুরা) ১৪৩৯/১৬ আশ্বিন ১৪২৪/১ অক্টোবর ২০১৭।

প্রকাশকের কথায় আপনি, জনাব আহমদ হাসান চৌধুরী বলেন, 'দীর্ঘকাল এ বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ও গভীর পর্যবেক্ষণের ফলে কবির এ কবিতাসমূহ নানাভাবে ব্যতিক্রমী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনন্যতার দাবীদার। সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের কেউ কেউ মহানবী ও উম্মাহ সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারায় কবিকে স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্যে বিশিষ্ট ও দিক নির্দেশক ভূমিকায় নিবেদিত রূপে চিহ্নিত করেছেন।'.... হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত লেখালেখি ও বক্তব্যে অসংলগ্ন, পরিমিতি বিহীন ও বিভ্রান্তিমূলক শব্দ পরিহারের আহ্বান জানিয়েছেন। এ গ্রন্থের কিছুসংখ্যক কবিতায় তাঁর এ আহ্বান ছন্দিত হয়েছে। এটি মহানবী প্রাসঙ্গিক লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতির ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়নিষ্ঠার আহ্বান এবং আমাদের দৃষ্টিকোণে যথার্থ আলোকপাতধর্মী।"...." সামগ্রিক বিবেচনায় ইসলাম ও বিশ্বনবী প্রেমিক কাব্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকা মহলে এ বই বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার বিপরীতে মানবতার বিজয়ে বিশ্বাসী বিশ্বজনের সাথে আমাদেরও স্বপ্ন, পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা গবেষণার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ বাইরের আগ্রাসনের বিপরীতে সংহত, ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেবে; নিপীড়িত জন-গোষ্ঠীসমূহের ত্রাণ ও মুক্তিতে সফল ভূমিকা রাখবে এবং চূড়ান্ত ভাবে বিশ্ব মানব কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

এ গ্রন্থে আমার ভূমিকা থেকে: বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশস্তি ইলাহী কালাম কুরআন মাজীদ ভিত্তিক তাঁর অনুপম কল্যাণ-বার্তার শ্রেষ্ঠত্ব, এ জীবন-বিধান যথাযথ অনুসরণ ও মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ ও উজ্জীবন বিষয়ক আমার কিছুসংখ্যক কবিতার সংকলন।

আমার কাব্যে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার, ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শক্তি সঞ্চয় ও কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের রজ্জু ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে ধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। আত্মরক্ষা তখনই সম্ভব হবে। কবিতার বিপুলাংশ বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন বহুল । ব্যতিক্রমী এতে উত্তর-প্রজন্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ রয়েছে।

'কা কস্য পরিবেদনা' শীর্ষক কবিতা থেকে:

"অন্ধকার দেখি আর আক্কেল গুড়ুম!
গোবর-গণেশদের কল্যাণে অরণ্যে রোদন,
সাঁতরে অথৈ জলে অস্তিত্বের অগ্নিপরীক্ষায়
বেশ ক'দশক পাড়ি,
মূর্খ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়।
কবে সে ধর্মের কল নড়বে বাতাসে

অলৌকিক সেই আশে
স্বপ্নে ঢেকুর তুলে।
আহা রে বুদ্ধির ঢেঁকি!

তবু তো স্বপ্ন দেখি!
কা কস্য পরিবেদনা?
চোরাবালি ঠেলে যাই চোখে সরষে ফুল
টনক নড়বে কভু? না কি এই ভুলের মাশুল
বুদ্ধির ঢেঁকিগুলো গুণবে সে কিয়ামত তক?
এদের ভাঙাতে ঘুম সে কবি কে আনবে সবক?"

বিশিষ্ট লেখক গবেষক ড. আবদুল ওয়াহিদের মাধ্যমে এ বইয়ের প্রাথমিক কিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছিল কিছুকাল আগে। শেষ পর্যন্ত বই প্রকাশের কাজ আগানো যায়নি নানা কারণে। তাঁর সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানাই। অতঃপর এ গ্রন্থের প্রকাশনায় এগিয়ে এসেছেন শ্রদ্ধেয় আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (র.) এর সুযোগ্য পৌত্র বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহমদ হাসান চৌধুরী। তাঁর আন্তরিকতায় বিশ্বনবী ﷺ ও উম্মাহ কম্পোজ উত্তর প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শানে কাব্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, রিসালতের মাহাত্ম্যের পতাকা তুলে ধরতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার জন্য তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হোন, এই প্রত্যাশা। এ সাথে তাঁর পিতামহ ওলীশ্রেষ্ঠ ফুলতলী ছাহেব কিবলাসহ সকল নবী প্রেমিকের পরকালীন নাজাত ও দরজার বুলন্দীর জন্য দুআ করছি। ফুলতলী পরিবার ও অনুসারীদের নেতৃত্বে আসীন মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরীসহ পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং কল্যাণ কামনা করছি। 'বিশ্বনবী ﷺ ও উম্মাহ'-এ মুসলিম উম্মাহর দেশে দেশে অনৈক্য হানাহানির প্রেক্ষিতে বাইরের আগ্রাসী নিপীড়নের কাব্য-চিত্র এসেছে: অনেক কবিতায় প্রবাদ-প্রবচনের শব্দাবলি রয়েছে। বিশ্বনবী ﷺ ও ইসলাম: উপস্থাপনায় যথাযথ শব্দভাবনা ও চয়ন শিরোনামে (পৃ.৮৫-১০৪) একটি প্রবন্ধ রয়েছে, যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় (গবেষণা ত্রৈমাসিক) এপ্রিল-জুন ২০০১ এ প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্যিক গুণীজনের মূল্যায়নে কবি আবদুল মুকীত চৌধুরী ও তাঁর গ্রন্থাবলি প্রবন্ধ ড. সৈয়দ শাহ এমরান এ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

পবিত্র কুরআন সুন্নাহর আদর্শে মুসলিম উম্মাহর উজ্জীবন, উত্তরণ, পারলৌকিক শাফাআত ও নাজাত কামনায় এবং বিশ্বের অমুসলিম ব্যক্তিত্ববৃন্দ, যাঁরা নিরপেক্ষ মূল্যায়নে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে মানবশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় সম্মান জানিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় এ গ্রন্থ সমর্পিত।

পরওয়ানা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়ক আপনার অন্য গ্রন্থ 'মহানবী ﷺ ও উজ্জীবন' সম্পর্কে বলুন।

আবদুল মুকীত চৌধুরী: রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিম উম্মাহর উজ্জীবন প্রাসঙ্গিক আমার গ্রন্থ 'মহানবী ﷺ ও উজ্জীবন'। এতে আমার ভূমিকার শেষ কথা: সকল উম্মাহ প্রেমিকের সাথে আমাদেরও প্রত্যাশা উজ্জীবন-মহানবী ﷺ-এর আদর্শে। উম্মাহর অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও হানাহানির অবসান, সংহতি ও ঐক্য বাস্তবায়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা ও মানব কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা এবং অপশক্তির মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সফল হলে তা হবে অতীতের মতই মানব জাতি তথা সৃষ্টিজগতের কল্যাণে বৈশ্বিক নেতৃত্বের অভিযাত্রায় আরেক স্বর্ণযুগের সূচনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত জীবন-বিধান কুরআন মাজীদ ও রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাহর আদর্শে পুনরভ্যুদয়ে সব ভেদাভেদ ভুলে হোক আমাদের সম্মিলিত মুনাজাত।

'প্রকাশকের কথা'র অংশবিশেষ: "তাঁর প্রশাংসার ধারা নজরুল-বৃত্ত থেকে একাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম কালোত্তীর্ণ দীওয়ান-ই-আলী রা.-এর প্রথম খণ্ড তাঁর কাব্যানুবাদ। নাত কাব্যে শব্দচয়নে বিশেষ সতর্কতার আহ্বান রেখেছেন কবি। বলেছেন, অনুপম নবী প্রসঙ্গে শব্দাবলিও এ দৃষ্টিকোণ ও পর্যায়েরই হতে হবে। না হলে তা অবমূল্যায়নে গড়াবে, এবং তা হবে আত্মঘাতী। এ গ্রন্থের প্রথম পর্ব মহানবী (সা.) বিষয়ক কাব্য (পৃ.১৩- ৪২)। সূচনায় বিশ্বনবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী কল্কি অবতার, Messenger of Mercy: Prophecy of Buddha, 'মৈত্রেয়' 'মেওয়্যা' ও 'আহলে বাইত'। এখানে কাব্যে ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ প্রসঙ্গ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন স্মরণিকা মীলাদুন্নবী ১৪৪১ হিজরী ও সুবহে সাদিক ১৪৪১ হিজরী, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া: The New Nation, Robiul Awal 12,1440 Hizri, আহলে বাইত কবিতাও সুবহে সাদিকে ছাপা হয়েছিল। কবিতা মুহাম্মদ ﷺ অগ্বেদে নরাশংসা-সুবহে সাদিক ১৪৪০ ঈসায়ী। এখানে কবিতাসমূহের ভিন্নত্ব ও অনন্যতা একটি মূল্যায়নের দিক। কারণ, এমন প্রকাশনা দেখা যায় না। মহানবী ﷺ বিষয়ক প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীর কাব্যরূপ সাহিত্যক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়। পরবর্তী কবিতা 'কল্যাণ বার্তা'-এক, বিশ্বনবী ﷺ ও উম্মাহ, দুই অবাঞ্ছিত শব্দ নিষিদ্ধ প্রবেশাধিকার, সুবহে সাদিক ১৪৩৭ হিজরী, উম্মাহ, আল্লাহর রজ্জু খুঁজি-ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ স্মরণিকা ২০১৬-তমদ্দুন মজলিস, বিশেষণ ম্লান ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৪৩৮ হিজরী, শব্দচয়ন, সুবহে সাদিক ১৪৩৮ হিজরী, সমক্ষে স্বর, ঈদে মীলাদুন্নবী স্মরণিকা ১৪৩৯ হিজরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, 'জীবন-বিধান'-সুবহে সাদিক ১৪৩৯ হিজরী এবং শব্দ অন্বেষা'য় ও বাকভঙ্গী শ্রেষ্ঠ উচ্চতায়। এ সব কবিতার অধিকাংশ জুড়েই রাসূল ﷺ সম্পর্কে শব্দচয়ন, পরিবেশনের আদব ও তাযীম প্রাসঙ্গিকতা। এ দিকটি বিশ্বনবী ﷺ-সম্পর্কিত সমকালীন কাব্য-ভাবনায় ব্যতিক্রমী ভাবতে পারেন।

পরবর্তী অধ্যায় 'উজ্জীবন (বর্ণমালার স্বর্ণমালা)'। এখানে স্বর অ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি বর্ণে চার পঙক্তি করে দু'শপঙক্তির কাব্যে বাগধারার ব্যতিক্রমী কবিতা। একুশে ও বর্ণমালার প্রাসঙ্গিকতায় জাগরণ-বার্তা। উদাহরণ:

ক. কপাল ফেরার জন্য চাই কান খাড়া, শাপে বরের জন্য খাড়া শিরদাঁড়া।

শনির দৃষ্টি কেটে ওঠায় হাত পাকান, কই মাছের প্রাণ সম্বল সামনে যান।

খ. খাল কেটে কুমির আনতে ফাঁদে পা বাঘে ভুলে স্বতঃসিদ্ধ আঠারো ঘা। বসন্তের কোকিল থেকে গা বাঁচান, নয় খেসারত পাল্লা ভারি সন্নিধান।

গ. সৎসঙ্গে স্বর্গবাসের কথা ঠিক, অসৎসঙ্গে সর্বনাশের ভিন্ন দিক, দৃষ্টিকোণ এ দুই থেকে গড়ি তাই উজ্জীবনের বার্তা মহৎ এতে পাই।

এসবে ইসলাম শব্দ নেই মহানবী ﷺ উজ্জীবন, উত্তরণ। প্রসঙ্গ নেই, তবে মানবতার বার্তা আছে। আর আমাদের লক্ষ্য তো মানবিক এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (পৃ.৫৫-৮১), এ বিশ্বনবী ﷺ ও উম্মাহ থেকে নেয়া সাহিত্যিক গুণীজনের মূল্যায়নে কবি আবদুল মুকীত চৌধুরী ও তাঁর গ্রন্থাবলি/ ড. সৈয়দ শাহ এমরান। বইয়ের ফ্ল্যাপে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বিশ্বের কয়েকজন অমুসলিম মনীষীর শ্রদ্ধার শব্দমালা। এ গ্রন্থ সমর্পিত হয়েছে বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, চিন্তাবিদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সাবেক সচিব জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম-কে।



মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির সমীকরণ কূটনীতি, নির্বাচন ও সম্ভাব্য যুদ্ধ

মুহাম্মাদ বিন নূর

> নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট করেছে, ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন এখনো গভীর এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্থিতিশীলতা ফিরে আসার সম্ভাবনা সীমিত। সবচেয়ে সহজ সমাধান ছিল যে কোন এক জোট আরব দলসমূহের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে ফেলবে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু আরবদের উপর গণহত্যা চালানোকে দলমত নির্বিশেষে যে দেশে সমর্থন করা হয়, সে দেশের কোন রাজনৈতিক দলই আরবদের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের রাজনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।

১.

গত ২৬ অক্টোবর সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সমন্বয়ে গঠিত মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ইরান সফর করে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং তুরস্কের গোয়েন্দাপ্রধান ইব্রাহিম কালিন। তেহরানে তারা ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানসহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন।

সফরটির গুরুত্ব বহুমাত্রিক। আগস্টে স্বাক্ষরিত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির মূলনীতি অনুযায়ী, কোনো সদস্য রাষ্ট্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণকে সব সদস্যের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করার কথা। ইরান-সংশ্লিষ্ট হুতিদের সৌদি আরবে হামলা এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে জোটের সদস্যদের তেহরান সফর আঞ্চলিক কূটনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আলোচনায় আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমন, সম্ভাব্য অনাক্রমণ কাঠামো, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংলাপ পুনরায় শুরু এবং হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তার মতো বিষয় গুরুত্ব পায়। ফিলিস্তিন ও লেবাননের পরিস্থিতিও আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠক শেষে চার দেশ আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়। তবে কোনো চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি।

সামগ্রিকভাবে, এই সফরকে ইরানের প্রতি মক্কা জোটের কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তনের চেয়ে সংঘাত নিয়ন্ত্রণে একটি বাস্তববাদী কূটনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা অধিক যুক্তিসংগত। মক্কা জোটের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সরাসরি ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতের বদলে কূটনৈতিক সমাধানকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে এই সফরকে কোন কোন বিশ্লেষক যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে আঞ্চলিক শক্তিসমূহের সংকট সমাধানের উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন, অন্যদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতিতেই কিংবা অবগতিতে এ সফর হয়েছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানে সামরিক উদ্যোগকে এখনো বিবেচনায় রাখলেও মক্কা জোটের সদস্যদের নিকট সমঝোতাই যে অধিক কাম্য, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মক্কা জোটের সমন্বয়ের বিষয়টি সত্য হলেও উভয়পক্ষের হিসাব নিকাশ যে আলাদা, তা বলাই বাহুল্য।

২.

২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ইসরায়েলের জাতীয় নির্বাচনে কোনো পক্ষই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬১টি আসন নিশ্চিত করতে পারেনি। চূড়ান্ত ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থি জোট ৫৩টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট পেয়েছে ৪৮টি আসন। উল্লেখযোগ্যভাবে, আরব রাজনৈতিক দলগুলো সম্মিলিতভাবে ১৯টি আসন অর্জন করেছে, যা দেশটির নির্বাচনী ইতিহাসে তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

নির্বাচনের ফলাফল নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অবস্থানকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত না করলেও তার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পথ জটিল করেছে। অন্যদিকে, বিরোধী জোটের সামনে সরকার গঠনের সুযোগ থাকলেও আরব

দলগুলোর সমর্থন ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কঠিন। কিন্তু এসব দলের সঙ্গে জোট গঠনে বিরোধী শিবিরের একাংশের আপত্তি রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে কয়েকটি সম্ভাবনা সামনে এসেছে: নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে নতুন জোট সরকার যেখানে হয়তো বিরোধী শিবিরের কোন কোন দল যোগ দিতে পারে, অথবা বিরোধী জোট সরকার গঠন করতে পারে নেতানিয়াহুর জোটের কোন কোন দলের সমর্থনে আর না হলে আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে সরকার চলবে এবং নতুন করে নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বড় দুই জোটই আপাতত সরকারে থাকবে। তবে নেতানিয়াহু এবং তার সরকারের কিছু শীর্ষ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ থাকলে বিরোধীপক্ষ সে জাতীয় সরকার না মেনে নেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট করেছে, ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন এখনো গভীর এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্থিতিশীলতা ফিরে আসার সম্ভাবনা সীমিত। সবচেয়ে সহজ সমাধান ছিল যে কোন এক জোট আরব দলসমূহের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে ফেলবে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু আরবদের উপর গণহত্যা চালানোকে দলমত নির্বিশেষে যে দেশে সমর্থন করা হয়, সে দেশের কোন রাজনৈতিক দলই আরবদের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের রাজনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।

আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন সরকারের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে। গাযা, ইরান ও লেবানন প্রশ্নে ইসরায়েলের নীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা অনেকাংশে নির্ভর করবে সরকার গঠনের সমীকরণের ওপর। অবশ্য অবস্থা যাই হোক, আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার ফলে ইরান, গাযা ও লেবাননে ইসরায়েলের আরো আগ্রাসী রূপ দেখার সম্ভাবনাই বেশি। ইরানে দীর্ঘ বিরতির পর আবার সরাসরি ইসরায়েলী হামলা আবার শুরু হতে পারে মার্কিন নির্বাচনের পরপর।

৩.

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনকে তার প্রশাসনের জনপ্রিয়তা ও নীতিগত অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের (House of Representatives) ৪৩৫টি আসনের সবকটি এবং সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে ৩৫টির জন্য ভোট গ্রহণ করা হবে।

বর্তমানে উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক জনমত জরিপে ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে রয়েছে। ২৬ অক্টোবর প্রকাশিত রয়টার্স-ইপসোস জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ৫৩ শতাংশ এবং রিপাবলিকানদের ৪৪ শতাংশ পাওয়া গেছে। ফলে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। তবে সিনেটে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর বিষয়টি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। মূল্যস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়, অভিবাসননীতি এবং ইরান যুদ্ধ নির্বাচনের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠেছে।

নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফলের ওপর নির্ভর করে ট্রাম্প প্রশাসনের পরবর্তী দুই বছরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক গতিপথ নির্ধারিত হতে পারে। ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ অথবা উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ব্যয়, বাণিজ্যনীতি, অভিবাসন এবং পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কংগ্রেসে বিরোধিতা বাড়বে। একই সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের ওপর তদন্ত ও নযরদারী জোরদার হতে পারে।

কংগ্রেসে বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণ ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক সহায়তা এবং বাজেট বরাদ্দ নিয়ে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, রিপাবলিকানরা উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলে ট্রাম্পের নীতিগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সুযোগ বাড়বে।

৪.

মক্কাজোটের তিন দেশ থেকে শুরু করে কাতার এমনকি চীন-রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রসমূহও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কূটনৈতিক সমাধানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলে এ কথা সহেজই অনুমেয়, বাস্তবে আরেকটি সামরিক উত্তেজনা প্রায় নিশ্চিত। ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আরেকবার সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়াবে, ইসরায়েলও সেখানে যুক্ত থাকবে, এটা এখন প্রায় অনিবার্য। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যদি ট্রাম্পের দল জিতে যায়, তাহলে তো কথাই নেই, এমনকি হারলেও মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি নিশ্চিত। কারণ ভোট সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের মধ্যে প্রায় ২ মাস সময় রয়েছে। নির্বাচনের আগে ভোটের স্বার্থে সরাসরি সামরিক আক্রমণ থেকে বিরত থাকলেও নির্বাচনের পর সেটার দরকার হবে না, ট্রাম্প তথা তার দলের তখন আর হারানোর কিছু থাকবে না। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতাই যেন অনিবার্য, যদিও সৌদি, তুর্কী, পাকিস্তান, কাতার, চীন, রাশিয়া, মিসর থেকে শুরু করে বহু রাষ্ট্র সে ঝুঁকি এড়াতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



সাময়িক

বি দ আ ত
ধারণা ও বিশ্লেষণ

মো. জিয়াউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এছাড়া পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এমন সব আমল করেছেন যা নবী ﷺ ও সাহাবীদের যুগে বিদ্যমান ছিলো না। এছাড়া ইমাম নববী (র.) আল আযকার, ইবনুস সুন্নী (র.) এর আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইল কিতাবে অসংখ্য এমন আমলকে উল্লেখ করেছেন, বিস্তারিত জানার জন্য উক্ত কিতাব দুটি দেখা যেতে পারে।

তাবিঈও পরবর্তী উলামায়ে কিরামের এমন কিছু আমল যা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের যামানায় ছিলো না কিন্তু তা বৈধ।

১। উমাইর ইবন হানী (র.)

ইমাম তিরমিযী (র.) 'আবওয়াবুদ দুআ'তে মাসলামাহ ইবন আমর থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন উমাইর ইবন হানী (র.) প্রত্যেক রাতে এক হাজার রাকআত নামায পড়তেন এবং এক লক্ষ বার তাসবীহ পাঠ করতেন। (তিরমিযী ১২/২৯৮, ইকামাতুল হুজ্জাহ, অনুবাদ-ইসলামে অধিক নফল ইবাদাতের রূপরেখা ১০৭)

২। হযরত উয়াইস আলকারানী (র.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে হযরত উয়াইস কারানী (র.) এর কাছে 'ইসতিগফার' তথা গুনাহ মাফের জন্য দুআ চাইতে আদেশ করেছেন।

ইমাম আবূ নুআইম (র.) বলেন, আমাদেরকে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আহমদ হাসান ইবন মুহাম্মদ এর সূত্রে আসবাগ ইবন যায়দ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, হযরত উয়াইস আলকারানী (র.) যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, তিনি বলতেন আজ রাত্র রুকূর জন্য। অতপর সকাল পর্যন্ত তিনি রুকূর মাধ্যমেই কাটিয়ে দিতেন। আবার কোনোদিন সন্ধ্যা বেলায় বলতেন আজকের রাত্র সিজদাহর জন্য। এই বলে তিনি সকাল পর্যন্ত সিজদায় কাটিয়ে দিতেন। (হিলইয়া ২/৮৭, প্রাগুপ্ত ১০৭)

৩। আমির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কায়স (র.)

ইমাম আবূ নুআইম (র.) বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল আবাদী তাঁর পিতার সূত্রে ইয়াযীদ ইবন ওয়াহাব ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেন আমির ইবন আব্দুল্লাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাবিঈনদের একজন। প্রতি রাতে তিনি তাঁর নিজের উপর এক হাজার রাকাআত নামায পড়া আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। (সিফাতুস সাফওয়াহ ৩/২০৩,প্রাগুপ্ত ১০৮)

৪। আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ইবরাহীম আন নাখাঈ আল কূফী (র.)

ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইয়াফিয়ী (র.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম নাখাঈ (র.) দিনে রাত্রিতে সাতশত রাকআত নামায পড়তেন। হিলইয়াতুল আউলিয়াতে এসেছে ইমাম আবূ নুআইম (র.) বলেন, আমাদেরকে আবূ বকর ইবন মালিক আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল এর সূত্রে মানসূর হয়ে ইবরাহীম নাখাঈ (র.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আসওয়াদ (র.) রামাদানে প্রতি দু'রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ঘুমিয়ে নিতেন। আর রামাদান বাদে অন্য সময়ে তিনি প্রতি ছয় রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। (মিরআতুল জিনান ১/১৫৬,সিফাতুস সাফওয়াহ ৩/২৩,প্রাগুক্ত ১০৯)

৫। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব আবূ মুহাম্মাদ আল মাখযুমী (র.)

আবূ নুআইম (র.) বলেন, আমাদেরকে আবূ মুহাম্মাদ আহমদ ইবন রূহ এর সূত্রে আব্দুল মুনঈম থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র.) পঞ্চাশ বছর যাবত ইশার নামাযের উযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। (সিফাতুস সাফওয়াহ ২/৮০,প্রাগুপ্ত ১১০)

৬। উরওয়া ইবন যুবাইর ইবন আওয়াম আবূ আব্দিল্লাহ আল আসাদী আল মাদানী (র.)
ইমাম যাহাবী (র.) বর্ণনা করেন, উরওয়া ইবন যুবাইর (র.) প্রত্যহ দিনের বেলায় কুরআনুল কারীমের এক চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করতেন এবং রাত্রি বেলায় কুরআনের সেই অংশ দ্বারা তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন। অর্থাৎ সারারাত নামাযে তিনি কুরআনের ঐ অংশই তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তিনি নিয়মিত রাত্রি জাগরণ করতেন তবে একরাত্রে তাঁর পা কেটে গিয়েছিল ঐ রাত্র ছাড়া। (আল ইবার ১/১১০, প্রাগুক্ত ১১০)

৭। ইমাম যাহাবী (র.) 'আল ইবার' কিতাবে বলেন, মালিক বলেছেন মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম যাইনুল আবিদীন (র.) মৃত্যু পর্যন্ত রাত দিনে এক হাজার রাকাত নামায পড়তেন। তিনি বলেন, তাঁর ইবাদতের কারণেই তাঁকে যাইনুল আবিদীন বলা হতো। (১/১১১,প্রাগুক্ত ১১৩)

৮। আবুল খাত্তাব কাতাদাহ ইবন দিআমাহ (র.)
ইমাম আবূ নুআইম (র.) বলেন আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন আহমদ মুহাম্মদ ইবন আইয়ূব এর সূত্রে সাল্লাম ইবন আবী মুতী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাতাদাহ (র.) প্রত্যেক সাত রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। কিন্তু যখন রামাদান চলে আসত তখন তিনি প্রত্যেক তিন রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। আর যখন রামাদানের শেষ দশক চলে আসত তখন প্রত্যেক রাতে একবার খতম করতেন। (হিলইয়া ২/৩৩৮,প্রাগুক্ত ১১৩)

৯। সাইদ বিন যুবাইর (র.)
ইয়াফিয়ী (র.) মিরআতুল জিনান এ বলেন, বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবন যুবাইর (র.) বাইতুল্লাহ শরীফে এক রাকআতে (সমগ্র) কুরআন পাঠ করতেন। বিকা ইবন আবী ইয়াস বলেন, এক রামাদানে সাঈদ ইবন যুবাইর (র.) আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন শরীফ ধরে রাখো, অতঃপর তিনি কুরআন খতম করার পর তার বসা থেকে উঠেন।

মাহমূদ ইবন সুলাইমান আল কাফাবী (র.) কৃত 'আলামুল আখইয়ার ফী তাবাকাতি ফুকাহায়ি মাযহাবিন নুমান আল মুখতার' এ এসেছে যে, ইসমাঈল ইবন আব্দিল মালিক বলেন, সাঈদ ইবন যুবাইর রামাদানে আমাদের ইমামতী করতেন। একরাতে তিনি ইবন মাসঊদ (রা.) এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী তিলাওয়াত করতেন, আরেক রাতে যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) এর কিরাত অনুযায়ী তিলাওয়াত করতেন। হিলাল ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সাঈদ ইবন যুবাইর (র.) বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করে এক রাকআতে (পুরো) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রতি দুই রাতে একবার কুরআন খতম করতেন । ইমাম যাহাবী (র.) ও 'তাবাকাতুল কুবরা'তে এরকম বর্ণনা করেছেন। (১/১৯৭,প্রাগুপ্ত ১১৪)

১০। ইমাম আযম আবূ হানীফা নুমান ইবন সাবিত আল কূফী (র.)
বহু নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরাম ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর কঠোর সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন।

শামসুল আইম্মাহ ইমাম কারদারী (র.) তাঁর রিসালাহর মধ্যে বলেন- ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ত্রিশোর্ধ্ব বছর ধরে ইশার নামাযের উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। কোন বর্ণনায় চল্লিশ বছরের কথা রয়েছে। তিনি প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। আর রামাদান মাসে দিনে দু'বার করে খতম করত: আর রাতে একবার। ইবনুল মুবারক (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) দুই রাকাআতে পুরো কুরআন জমা করতেন। অর্থাৎ দুই রাকাআতেই তিনি পুরো কুরআন খতম করতেন।

তিনি আরো বলেন, চারজন ইমাম দুই রাকাআতে কুরআন খতম করেছেন। যথা: উসমান ইবন আফফান, তামীম দারী, সাঈদ ইবন জবাইর ও আবূ হানীফা (র.)। (সংক্ষেপে শামসুল আইম্মাহর কথা শেষ হল)

ইমাম নববী (র.) এর 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত' এ এসেছে- ইবরাহীম ইবন ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.) এর চেয়ে অধিক পরহেযগার, বড় ফকীহ আর কাউকে দেখিনি। সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের সময়ে মক্কায় আবূ হানীফা (র.) এর চেয়ে অধিক সালাত আদায়কারী কোন ব্যক্তি আসেনি। হযরত ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব আযযাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র.) রাত্রি বেলায় ঘুমাতেন না। আবূ আসিম আননাবীল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র.) কে তাঁর অধিক নামায পড়ার কারণে তাঁকে (খুঁটি) বলা হত।

আসাদ ইবন আমর থেকে বর্ণিত, আবূ হানীফা (র.) চল্লিশ বছর ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। অধিকাংশ রাত্রে এক রাকাআতে তিনি সমগ্র কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন। তাঁর এত কান্নার আওয়াজ শুনা যেত যে তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যেত। আবূ হানীফা (র.) এর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে বর্ণিত আছে যে, যে স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেছেন ঐ স্থানে তিনি সাত হাজার বার কুরআন কারীম খতম করেছেন।

হাসান ইবন উমারাহ থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হানীফা (র.) ইন্তিকাল করলে হাসান ইবন উমারাহ তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন এবং তিনি গোসল দানকালে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। ত্রিশ বছর যাবত আপনি রোযা ভাঙেননি (অর্থাৎ এই ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত রোযা রেখেছিলেন), এবং চল্লিশ বছর যাবৎ আপনার পার্শ্বদেশকে বালিশের উপর রাখেননি। ইবনুল মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হানীফা (র.) পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ এক উযূ দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। তিনি দুই রাকাআত নামাযে পুরো কুরআন খতম করতেন।

আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সাথে হাঁটতেছিলাম, এমন সময় তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, সে আরেক লোককে বলছেন, ইনি রাতে ঘুমান না। তখন আবূ হানীফা (র.) বললেন যে, আমার ব্যাপারে এমন কথা বলা ঠিক হবে না যা আমি করি না। এরপর থেকে তিনি নামায, দুআ এবং কান্নাকাটির মাধ্যমে রাত পার করে দিতেন।

মিসআর ইবন কিদাম (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি একদা রাতে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম এক লোক নামায পড়ছে, আমি তার কিরাত শুনে খুব অভিভূত হলাম। তো আমি দেখলাম যে তিনি প্রথমে কুরআনের এক সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করলেন, আমি ভাবলাম এবার মনে হয় তিনি রুকূতে যাবেন, কিন্তু তিনি রুকূতে গেলেন না। বরং পড়তে পড়তে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়লেন এরপর অর্ধেক পড়ে ফেললেন তারপরও রুকূতে গেলেন না। বরং এভাবে পড়তে পড়তে তিনি এক রাকাআতে পুরো কুরআন পড়ে শেষ করে ফেললেন। তারপর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) (সুবহানাল্লাহ)। যায়িদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি আবূ হানীফা (র.) এর সাথে তার মসজিদে ইশার নামায পড়লাম, এরপর মানুষরা সবাই বের হয়ে গেল কিন্তু মসজিদে যে কেউ আছে এটা কেউই বুঝতে পারল না। অতপর আমি তাঁকে একটি

মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করলাম।

এর পর তিনি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন এবং তিলাওয়াত করতে করতে-

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (سورة القمر-٦٤)

এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন।
মুআযযিন ফজরের আযান দেওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ এক আয়াতই বারবার পড়ছিলেন এবং আমি ও তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম।

কাসিম ইবন মান থেকে বর্ণিত, ইমাম আবূ হানীফা (র.)

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

এই আয়াত দ্বারা রাত কাটিয়ে দেন। সারাক্ষণ এই আয়াতই তিনি বারবার পড়েছেন এবং কান্নাকাটি করেছেন। মক্কী ইবন ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কুফাবাসীদের সাথে উঠাবসা করেছি কিন্তু তাদের মধ্যে আবূ হানীফা (র.) এর চেয়ে অধিক পরহেজগার আর কাউকে দেখিনি।

ইমাম ইয়াফিয়ী (র.) রচিত 'মিরআতুল জিনান' (১/৩১০) এ এসেছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমি আবূ হানীফা (র.) এর সাথে হাঁটতেছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তিকে আরেকজনকে বলতে শুনলাম তিনি বলছেন যে, এই হলো আবূ হানীফা, তিনি সারারাত্র জাগরণ করেন। তখন আবূ হানীফা (র.) বললেন, আল্লাহর কসম আমার ব্যাপারে এমন কথা বলা হবে যা আমি করি না এটা হতে পারে না। এরপর থেকে তিনি (সারারাত্র) জাগরণ শুরু করেন।

ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শারানী (র.) রচিত 'মীযানুল কুবরা' (১/৭৫পৃ.) তে এসেছে- ইমাম আবূ জাফর শিযামারী ইবরাহীম ইবন ইকরিমাহ আল মাখযূমী (র.) পর্যন্ত তাঁর নিজ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন আমি আমার সারা জীবনে আবূ হানীফা (র.) এর চেয়ে অধিক পরহেযগার, দুনিয়া বিমুখ, ইবাদতকারী এবং অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। ইমাম আবূ নুআইম (র.) অন্যান্য অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) পাঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে ইশার নামাযের উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

তিনি কখনো (রাত্রি বেলা) বিছানার সাথে তাঁর পিঠ লাগাননি। তিনি শুধুমাত্র যোহরের নামাযের পর বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। এবং তিনি বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কাইলুলাহর' মাধ্যমে তোমরা রাত্রি জাগরণে সহযোগিতা গ্রহণ কর।

মোল্লা আলী কারী (র.) কৃত 'আল আছমারিল জানিয়্যাহ ফি ত্বাকাতিল হানাফিয়্যাহ'তে এসেছে- ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা ইমাম আবূ হানীফা (র.) আমার কাছে রাত্রি যাপন করেছিলেন, তো দেখলাম তিনি সারা রাত্র জেগে কাটিয়েছেন এবং এক আয়াত বারবার পড়ে সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন। সেই আয়াত হল সূরা কামার এর ৪৬নং আয়াত তথা

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

আবূ হানীফা (র.) এর ব্যাপারে এও বর্ণিত আছে যে,

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

এই আয়াত দ্বারা কখনো কখনো পুরো রাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে এক ব্যক্তিকে তিনি ইশার নামাযে সূরা যিলযাল তিলাওয়াত করতে শুনলেন, তখন তিনি মুক্তাদী ছিলেন। সূরা যিলযাল এর তিলাওয়াত শুনে সকল মানুষ নামায পড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি দাঁড়িতে হাত দিয়ে মসজিদে বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন- হে ঐ মহান সত্তা যিনি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভালো কাজের ও ভালো দ্বারা বিনিময় দিয়ে থাকেন, হে ঐ মহান সত্তা যিনি সামান্যতম মন্দ কাজেরও মন্দ দ্বারা প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আপনি আপনার বান্দা নুমানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন।

হাফস ইবন আব্দির রহমান থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ত্রিশবছর যাবৎ এক রাকাতে পুরো কুরআন খতম করার মাধ্যমে সারা রাত জাগরণ করেছেন। (সারসংক্ষেপ শেষ হলো)

معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة

নামক কিতাবে এসেছে, শাইখ আত্তার 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে বলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রত্যেক রাত্রে তিনশত রাকাআত নামায পড়তেন। একদা তিনি বালকদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কোন এক বালক অপর আরেকজন বালককে বলল দেখ ইনি প্রতি রাতে এক হাজার রাকাআত নামায পড়েন এবং তিনি রাতে ঘুমান না। তখন আবূ হানীফা (র.) বললেন, আজ থেকে আমি নিয়ত করলাম প্রতি রাতে আমি এক হাজার রাকাআত নামায পড়বো এবং রাতে ঘুমাব না।

মিসআর ইবন কিদাম বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) দুনিয়া বিমুখতা এবং ইবাদতে কঠোর সাধনায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি আবূ হানীফা (র.) এর কাছে তার মজলিসে গেলাম, গিয়ে দেখলাম তিনি ফজরের নামায পড়ছেন। এর পর যুহর পর্যন্ত মানুষকে ইলম শিক্ষাদানে নিমগ্ন ছিলেন। তারপর যুহর থেকে আসর পর্যন্ত আবার ইলম শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হলেন। আসরের নামায পড়ে আবার মাগরিব পর্যন্ত দরসদানে নিমগ্ন হলেন।

অতপর মাগরিবের নামায পড়ে ইশার নামায পর্যন্ত আবার দরসদানে বসে গেলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম কী ব্যাপার! লোকটি এত ব্যস্ততার মধ্যে থেকে ইবাদতের জন্য সময় পায় কখন?! অবশ্যই আজ রাত আমি তাকে দেখে রাখব, (দেখব সে কখন ইবাদত করে)। আমি তাঁর প্রতি নযর রাখলাম এবং দেখলাম মানুষরা যখন (ইশার পর) বের হয়ে গেল তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এভাবে একবারে ফজর পর্যন্ত ছিলেন। ফজরের পূর্বক্ষণে তিনি বাড়িতে গিয়ে (পোষাক পরিবর্তন করে নতুন) পোষাক পরে আবার ফজরের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বের হয়ে আসলেন। (সংক্ষেপে শেষ হলো)

এতক্ষণ আমরা যা উল্লেখ করলাম হেদায়ার মুসান্নিফ 'মুখতারাতুন নাওয়াযেল' গ্রন্থে, ইমাম যাহাবী (র.) স্বীয় 'আলইবার বি আখবারি মান গায়ার' কিতাবে, ইমাম কাফাবী (র.) 'আল আখইয়ার ফি ত্বাকাতি ফুকাহায়ি মাযহাবিন নুমানিল মুখতার' গ্রন্থে, সুয়ূতী (র.) 'তাবয়ীযুস সহীফাহ' এর মধ্যে, ইবন খাল্লিকান 'অফায়াতুল আইয়ান' এর মধ্যে এবং অন্যান্য মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখিরীন বহু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম এরকম বহু কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো তাঁর ইবাদতে কঠোর সাধনা এবং অধিক পরহেযগারীতার উপর সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ বহন করে। এবং এই বিষয়গুলো এমন অধিক পরিমাণে বর্ণিত যে তা মুতাওয়াতিরে মানবীর স্তরে পৌঁছে গেছে।

উল্লিখিত কিতাবগুলো এবং অন্যান্য কিতাবগুলো যিনি অধ্যয়ন করেছেন, আশা করি এই ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘ হওয়ার ভয় না থাকলে উল্লিখিত কিতাবগুলো ছাড়াও তাঁর মানাকিবের উপর লিখিত রাসায়েল সমূহ এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তারীখের কিতাব থেকে এর চেয়ে আরো বহুগুণ বেশি উল্লেখ করা যেত। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আমি এতে সক্ষমও। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী তা-ই যার ভাষ্য কম কিন্তু উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত। (প্রাগুপ্ত ১১৬-১২৪)

(চলবে)



জবাবদাতা: মাওলানা ইমাদ উদ্দিন তালুকদার

আব্দুল আজিজ
সৌদি আরব

প্রশ্ন: আমি একজন ছাত্র মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে পড়াশোনা করছি। অনেক সময় কিছু জিনিসপত্র আমার মালপত্রের সাথে নিয়ে আসি যা হয়তো সরাসরি আমদানি করালে সরকারকে বেশ মোটা অংকের কর পরিশোধ করতে হতো, এই জিনিসপত্র নিয়ে আসা কি বৈধ হবে?

জবাব: বিদেশ থেকে পণ্য আনার ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে, কোনো পণ্য রয়েছে শুল্কমুক্ত আর কোনো পণ্যে শুল্ক আরোপ থাকে। আবার ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোনোটাতে ছাড় রয়েছে। সে হিসেবে আপনি যে পণ্য এনেছেন, তা যদি শুল্কের শর্তের ভেতরে পড়ে, তাহলে শুল্ক দেওয়া উচিৎ। কারণ রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স হলো অর্থ প্রাপ্তির অন্যতম উৎস। এই ট্যাক্স রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং নাগরিকের দায়িত্ব। সরকারের যেহেতু দেশের জনগণের সেবা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ তাই জনগণের জন্য আবশ্যক হলো সরকারের প্রাপ্য যথাযথ পৌঁছে দেওয়া। যদি কেউ সেখানে মিথ্যা, প্রতারণা কিংবা ধোঁকার আশ্রয় নেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

-যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে, সেও আমার উম্মতভুক্ত নয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯৪)

এ ব্যাপারে "বুহুস ফী কাদায়া ফিকহিয়া মুয়াসারা"-এর উল্লেখ রয়েছে,

كل من يسكن دولة فانه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها الخ (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة-١٦٦

-রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি কথায় এবং কাজে রাষ্ট্রের বিধিবিধান পালনে বাধ্য। তখন তাদের জনগণের সেই বিধিবিধান পালন করা অবশ্যক। (বুহুস ফী কাদায়া ফিকহিয়া মুয়াসারা-১৬৬)

তাই আপনি যে পণ্য এনেছেন, তা শুল্ক ছাড়া আনা অনুমোদিত হয়, তাহলে সমস্যা নেই আর যদি অনুমোদিত না হয়, তাহলে অনুচিৎ। তবে এ জন্যে ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা হারাম হবে না।

ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس" لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق" ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة (كتاب الكراهية، فصل فى البيع-٤٧٢٢/٤، وكذا فى البدائع الصنائع-١٢٩/٥)

ফয়েজ আহমদ সাব্বির

প্রশ্ন: অনেকেই দেখি দাঁত পড়ে গেলে নতুন করে বাঁধায়। আমার মনে কৌতুহলবশত প্রশ্ন এভাবে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে দাঁত বাঁধানো কি জায়িয? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

জবাব: দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে রুট ক্যানেল করা, দাঁতে ফিলিং করা, ক্যাপ লাগানো, কৃত্রিম দাঁত সংযোজন করা কিংবা দাঁত বাঁধানো- সবই জায়িয। এসব চিকিৎসায় সাধারণত ব্যবহৃত সিরামিক, কম্পোজিট, জিরকোনিয়া, ধাতু ইত্যাদি ব্যবহারেও অসুবিধা নেই। এমনকি চিকিৎসার প্রয়োজনে সোনা-রুপা ব্যবহার করাও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী বৈধতার অবকাশ রাখে।

মূলনীতি: চিকিৎসা ও প্রয়োজনের জন্য শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করা বৈধ। তবে নিছক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সুস্থ দাঁতের স্বাভাবিক গঠন পরিবর্তন করা বৈধ নয়।

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ رضي الله عنه:

أَنَّ أَنْفَهُ قُطِعَ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. سنن ابي داود: ٢٣٢٤

إِذَا تَحَرَّكَتْ سِنُّ رَجُلٍ وَخَافَ سُقُوطَهَا فَشَدَّهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

وذكر الحاكم في المنتقى لو تحركت سن رجل وخاف سقوطها فشدها بالذهب أو بالفضة لم يكن به بأس عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى

ج٥ - ص٣٣٦ - كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية - الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به - المكتبة الشاملة

والله أعلم بالصواب



খাতুন

ইতিহাসে মুসলিম নারীর অনন্য দৃষ্টান্ত

সাইয়্যিদা ফাতিমা বিনতে খলীল

> ❝ ইসলামের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দেখি জিহাদের ময়দানেও নারীরা পুরুষের সাথে থেকেছেন। উম্মে আম্মারা মাযিনিয়া রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, এক যুদ্ধে আমি দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় আছেন। তাঁর আশেপাশে সর্বসাকুল্যে দশজনের মতো হবেন। আমি, আমার দুই ছেলে এবং আমার জীবনসঙ্গী সামনে থেকে তাঁকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করছিলাম। অনেকেই পরাস্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন, আমার সাথে কোনো ঢাল নেই। একজন আহত সৈনিকের সাথে ঢাল দেখে তিনি বললেন, যুদ্ধরত কারো হাতে তোমার ঢাল ছুঁড়ে দাও। লোকটি তার ঢাল ছুঁড়ে দিলে আমি তা তুলে নিলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। এক অশ্বারোহী আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল এবং তরবারী দ্বারা আঘাত করতে লাগল। আমি ঢাল দ্বারা তার আঘাতকে প্রতিহত করতে থাকলাম। ❞

প্রত্যেক নারীরই আছে স্বয়ংসম্পন্ন শক্তিশালী সত্তা। ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরই এই সুমহান শাশ্বত ধর্মের কল্যাণে মুসলিম নারীগণ অসংখ্য উত্তম গুণাবলিতে বিশিষ্ট হয়েছেন। সমাজ জীবনে যারা যথার্থ ভূমিকা ও যথাযথ অবদান রাখতে ব্রতী হয়েছেন তাদের বিচক্ষণতা, বিশুদ্ধভাষিতা, গভীর জীবনবোধ ও অনুপম বাকশৈলী ছিল ঈর্ষণীয়। ধৈর্য ও অবিচলতা ছিল পর্বতপ্রমাণ। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নারীদের সম্মান করতেন এবং তাদের সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন। এরই কল্যাণে ইসলামী সমাজে নারী জাতি লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। অধিষ্ঠিত হয় অকৃত্রিম সম্মানের আসনে। এই প্রবন্ধে আমরা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম নারীর কিছু অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস পাব। আশা করি, এগুলো কিছুটা হলেও আমাদের প্রেরণা যোগাবে অনুসরণের জন্য, শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রী-গণের শিক্ষাদীক্ষা ও আমল আখলাকের বিষয়েও মনোযোগী ছিলেন। দেখুন না, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুওয়াইরিয়া রাদিআল্লাহু আনহার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুযার এবং শুকুরগুযার একজন নারী। পবিত্র জীবনসঙ্গিনীর মহিমান্বিত তাজ মস্তকে ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন উম্মুল মুমিনীনের ভূমিকায়। ইবাদতরত অবস্থায় দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে

বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি কালিমা শিখিয়ে দিই, এগুলো জপে জপে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ: পবিত্রতা গাহি আল্লাহর, গাহি বন্দনা-তাঁর সৃষ্টিসম, তুষ্টিসম; আরশসম, করুণাসম। (সহীহ মুসলিম)

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নারী সাহাবীদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আমল আখলাকের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। গুরুত্বারোপ করেছিলেন তাদের ঐহিক ও পারত্রিক সফলতা ও সৌভাগ্যের বিষয়েও। এমন অসংখ্য উদাহরণ শোভা পাচ্ছে সীরাত, হাদীস ও ইতিহাসগ্রন্থের পাতায় পাতায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যশোভায় যেসব মহীয়সী জ্ঞান ও প্রতিভার দ্যোতি ছড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা। তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞান ও বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারিণী। একাধারে একজন বিজ্ঞ ফকীহা, মুহাদ্দিসা, মুফাসসিরা। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন,

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عنه عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا

অর্থ: আমাদের কাছে কখনো কোনো হাদীস অস্পষ্ট লাগলে যখনই হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করতাম, তাঁর কাছে অবশ্যই কোনো না কোনো জ্ঞান লাভ করতাম। (তিরমিযী)

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার ধর্মীয় তাৎপর্যজ্ঞান তো ছিলই। বংশবিদ্যা, কাব্যজ্ঞানেও ছিলেন অতুলনীয়া। সাহিত্য ও ইতিহাসেও ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। চিকিৎসায়ও ছিল ভালো হাত-যশ। ইমাম শাবী (র). বলেন, হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি কুরআনের জ্ঞান, হারাম-হালালের জ্ঞান অর্জন করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে। কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ও বংশবিদ্যা অর্জন করেছেন হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছ থেকে। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করলেন কার কাছ থেকে? তিনি বললেন, দিগ্‌বিদিক থেকে আরবের বহু প্রতিনিধিদল আসতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি বিভিন্ন রোগের কথা বলতেন, প্রতিষেধক চাইতেন। আমি বিজ্ঞ হেকিম ও চিকিৎসকদের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনতাম, বুঝতাম ও আত্মস্থ করতাম। (সিয়ারু আলা মিন নুবালা: ২/১৯৭)

শুধু পবিত্র স্ত্রীগণ বা নারী সাহাবীই নন, সাধারণ নারীদের মাঝেও আছে অনন্য উদাহরণ। উম্মে দারদা সুগরাকেই দেখুন, (মূল নাম: হুজাইনা বিনতে ইয়াহইয়া আসাবিয়া) তিনি উম্মতের জন্য কত জ্ঞানই না সংরক্ষণ করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবনসঙ্গী আবূ দারদা (রা.)-সহ হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত আয়িশা (রা.), হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) প্রমুখ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। মহীয়সী এই তাবিঈ নারী ইলমে, আমলে শহরত হাসিল করেছিলেন। তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী ছিল ঈর্ষণীয়। দুনিয়ার প্রতি মায়া-মোহ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছিলেন। খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামালেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি অনেক বড় আলিমা ও ফকীহা ছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে এসে দ্বীনী ইলম হাসিল করত। তিনি দরস করাতেন। খলীফা আবদুল মালিকও তার দরসে বসতেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৪৭)

ইসলামের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দেখি জিহাদের ময়দানেও নারীরা পুরুষের সাথে থেকেছেন। উম্মে আম্মারা মাযিনিয়া রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, এক যুদ্ধে আমি দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় আছেন। তাঁর আশেপাশে সর্বসাকুল্যে দশজনের মতো হবেন। আমি, আমার দুই ছেলে এবং আমার জীবনসঙ্গী সামনে থেকে তাঁকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করছিলাম। অনেকেই পরাস্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন, আমার সাথে কোনো ঢাল নেই। একজন আহত সৈনিকের সাথে ঢাল দেখে তিনি বললেন, যুদ্ধরত কারো হাতে তোমার ঢাল ছুঁড়ে দাও। লোকটি তার ঢাল ছুঁড়ে দিলে আমি তা তুলে নিলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। এক অশ্বারোহী আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল এবং তরবারী দ্বারা আঘাত করতে লাগল। আমি ঢাল দ্বারা তার আঘাতকে প্রতিহত করতে থাকলাম। লোকটি না পেরে পলায়নপর হলে আমি তার ঘোড়ার পেছনের পা-জোড়ায় আঘাত করলাম। আরোহীসহ ঘোড়াটি পড়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে বলে উঠলেন, উম্মে আম্মারা, সামনে দেখো। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সহায়তা করলেন। লোকটিকে আমি মৃত্যুপুরে নামিয়ে দিলাম। (আল ইসাবাহ ফী তামঈযিস সাহাবা ৮/১৯৮)

ইসলামের ইতিহাসের মুসলিম নারীগণ অত্যাচারী শাসক-প্রশাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সৎসাহস দেখাতে পিছপা হননি। অকুণ্ঠিত চিত্তে সত্য বলা থেকেও বিরত থাকেননি। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহাকেই দেখুন। তাঁর কলিজার টুকরা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে হত্যা করার পর কুখ্যাত যালিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর ঘরে গেলেন এবং বললেন,

إِنَّ وَلَدَكِ الْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللهَ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَفَعَلَ بِهِ مَا فَعَلَ

অর্থ: আপনার সন্তান স্বেচ্ছাচারিতা করেছে, তাই আল্লাহ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছেন এবং তার সাথে যে আচরণ করার করেছেন। একথা শুনে হযরত আসমা (রা.) তার মুখের ওপর বললেন-

كَذَبْتَ وَاللهِ لَقَدْ كَانَ بارًا بِوَالِدَيْهِ صَوَّامًا قَوَّامًا فَلَقَدْ أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيْفٍ كَذَابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمْ شَرٌّ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُبِيرٌ. أَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ وأما الْمُبِيرُ فَلَا أَخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَقَدْ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ

অর্থ: তুই মিথ্যা বলছিস। আল্লাহর কসম, সে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারী ছিল। সদাসর্বদা সিয়াম-কিয়ামে রত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছিলেন, অচিরেই সাকীফে একজন মহা মিথ্যাবাদী ও একজন ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসুর আগমন হবে। শেষজন প্রথমজন অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হবে। আমরা সেই মিথ্যাবাদীকে দেখেছি। আর রক্তপিপাসু, আমার তো মনে হচ্ছে তুই-ই সেই রক্তপিপাসু। আরে, তুই তো তার দুনিয়া খেলি; কিন্তু সে তো খেয়ে নিলো তোর আখিরাত।

পরওয়ানা ডেস্ক



কী আবিষ্কার করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী?

মানবমস্তিষ্কের জটিল কার্যপ্রণালী এবং একক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণের যুগান্তকারী পদ্ধতি অপটোজেনেটিক্স আবিষ্কারের জন্য ২০২৬ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন স্নায়ুবিজ্ঞানী কার্ল ডাইসারোথ এবং জার্মানির দুই গবেষক পিটার হেগেম্যান ও গেওর্গ নাগেল। আয়ন চ্যানেল এবং অপটোজেনেটিক্স সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য তাদের এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। প্রতিবছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল ঘোষণা করে সুইডেনের স্টোকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট।

অপটোজেনেটিক্স কী?

মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ৯০ বিলিয়ন নিউরন বা স্নায়ুকোষ রয়েছে। এতদিন নির্দিষ্ট কোনো স্নায়ুকোষ কীভাবে অনুভূতি, স্মৃতিকথা বা আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তা সূক্ষ্মভাবে জানা প্রায় অসম্ভব ছিল। এই তিন বিজ্ঞানী অণুজীব বা শৈবালের লাইট-সেনসিটিভ বা আলো-সংবেদনশীল প্রোটিন ব্যবহার করে স্নায়ুকোষকে আলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। এর নাম অপটোজেনেটিক্স। এই পদ্ধতিতে কোনো জীবন্ত প্রাণীর মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলে নিউরনের সংকেত অন/অফ করা সম্ভব।

১৯৯০-এর দশকে পিটার হেগেম্যান শৈবাল নিয়ে গবেষণার সময় একটি বিশেষ প্রোটিন সনাক্ত করেন। সেটা আলোর সংস্পর্শে এলে খুব দ্রুত আয়ন চ্যানেল উন্মুক্ত করে। ২০০২-২০০৩ সালে গেওর্গ নাগেল ও হেগেম্যান যৌথভাবে চ্যানেলরোডোপসিন-২ নামের একটি প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করেন। এর সাহায্যে তারা প্রমাণ করেন যে এটি আলো ফেললেই তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। কার্ল ডাইসারোথ ২০০৫ সালে ইঁদুরের নিউরনে এই জিন স্থানান্তর করে প্রমাণ করেন, আলোর সংকেত দিয়ে মস্তিষ্কের একক কোষগুলোকে চালনা করা সম্ভব। ২০০৭ সালে তিনি অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ইঁদুরের মস্তিষ্কে স্নায়ুসংকেত নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন।

পারকিনসন্স, বিষণ্নতা, অ্যালঝাইমার্স, সিজোফ্রেনিয়ার মতো জটিল মানসিক ও স্নায়বিক রোগের কারণ উদঘাটন, এমনকি অন্ধত্ব দূর করা ও শ্রবণযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনেও অপটোজেনেটিক্স এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

নিউট্রিনো কী?

চলতি বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হালজেন। দক্ষিণ মেরুর শত শত মিটার বরফের নিচে এমন এক বিশাল ফাঁদ পেতে সুদূর মহাজাগতিক উৎস থেকে আসা উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনো শনাক্ত করার অবিস্মরণীয় কীর্তি গড়েছেন এই বিজ্ঞানী। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০২৬ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স।

মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় কণার নাম নিউট্রিনো। এ কণার কোনো চার্জ নেই, ভরও প্রায় শূন্যের কোঠায়। অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে এর মেলামেশা বা মিথস্ক্রিয়া নেই বললেই চলে। প্রতি সেকেন্ডে আপনার আঙুলের ডগার ওপর দিয়ে সূর্য থেকে আসা ৬৫ বিলিয়ন নিউট্রিনো চলে যাচ্ছে, অথচ আপনি কিছুই টের পাচ্ছেন না। কিন্তু এই অধরা কণাই যখন সুদূর কোনো গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে হাজার কোটি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে আসে, তখন সাথে নিয়ে আসে মহাবিশ্বের সবচেয়ে গোপন কিছু রহস্যের বার্তা। সেই অধরা ও রহস্যময় কণা শনাক্ত করে সেই বার্তা পাঠোদ্ধার করার উপায় আবিষ্কার করেছেন ফ্রান্সিস হালজেন। মহাজাগতিক রশ্মির অতি উচ্চ-শক্তির প্রোটন কণাগুলো কীভাবে তৈরি হয় এবং কোথা থেকে আসে, তা বহুকাল ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য ছিল। মহাজাগতিক কণা ত্বরকগুলোতে প্রোটন ত্বরান্বিত হওয়ার সময় তৈরি হয় নিউট্রিনো ও গামা রশ্মি। গামা রশ্মি মহাজাগতিক ধূলিকণায় আটকে যেতে পারে বা শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু নিউট্রিনোকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি মহাবিশ্বের কোনো কিছুরই নেই। তাই উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনোর গতিপথ অনুসরণ করতে পারলে মহাবিশ্বের চরম সহিংস ঘটনাগুলোর উৎসে সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব।

আশির দশকে হালজেন বুঝতে পারেন মহাজাগতিক নিউট্রিনো ধরার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হতে পারে দক্ষিণ মেরুর অ্যান্টার্কটিকার বরফের স্তর। কারণ সমুদ্রের পানির চেয়ে গভীর বরফ অনেক বেশি স্বচ্ছ ও স্থির। কিন্তু সেখানে চ্যালেঞ্জ ছিল প্রচণ্ড হিমশীতল অ্যান্টার্কটিকায় মাইলের পর মাইল বরফ গলিয়ে গর্ত করা এবং সংবেদনশীল আলো শনাক্তকারী সেন্সর বসানো। অনেক গবেষণার পর উষ্ণ পানি দিয়ে বরফ গলিয়ে গর্ত তৈরি করে বিশেষ কেবল ও অপটিক্যাল মডিউল (আলোক সেন্সর) বরফের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হয়। একটি মহাজাগতিক নিউট্রিনো যখন অতি দুর্লভভাবে বরফের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, তখন চার্জযুক্ত কণা তৈরি হয় এবং বরফের ভেতরে নীল আলোর এক সূক্ষ্ম ঝলকানি ছড়ায়। বরফের ভেতরের সেই আলোর দিশা দেখেই সেন্সরগুলো নিউট্রিনোর দিক ও শক্তি মেপে নেয়। বড় পরিসরে কাজ শুরুর পর তৈরি হয় আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি। বরফের গভীরে প্রায় এক ঘনকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ১,৪৫০ থেকে ২,৪৫০ মিটার গভীরে ৮৬টি কেবলে মোট ৫,১৬০টি আলোক সেন্সর স্থাপন করা হয়। ২০১৩ সালের মধ্যে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে তারা সত্যি সত্যিই সৌরজগতের বাইরের গভীর মহাবিশ্ব থেকে আসা নিউট্রিনো শনাক্ত করতে পেরেছেন।

ফ্রান্সিস হালজেনের প্রবর্তিত এই পথ ধরে এখন বিশ্বজুড়ে কাজ চলছে। বৈকাল হ্রদ, ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরে পানির নিচেও নতুন নিউট্রিনো টেলিস্কোপ তৈরি হচ্ছে। মহাবিশ্বে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যেগুলোর আলো হয়তো আমাদের কাছে পৌঁছায় না। কোনো কোনো বার্তা ধুলায় আটকে যায়, কোনোটি পথে শক্তি হারায়, কোনোটি মহাকাশের চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে তার উৎসের ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নিউট্রিনো এসব বাধার তোয়াক্কা করে না। সে ছুটে আসে প্রায় অপ্রতিরোধ্যভাবে। তারপর পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর গভীর বরফে কোনো এক মুহূর্তে একটি নিউট্রিনো পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খায়। তৈরি হয় ক্ষীণ নীল আলোর ঝলক। বরফের অন্ধকারে সেই ক্ষুদ্র আলো ধরে ফেলে আইসকিউবের একটি সেন্সর। সেই এক ঝলক আলোতেই লুকিয়ে থাকতে পারে মহাবিশ্বের বহু বিলিয়ন বছরের পুরোনো কোনো রহস্যের উত্তর।

অভ্যন্তরীণ

মাসিক পরওয়ানার উপজেলা ভিত্তিক পাঠক ফোরাম গঠনের উদ্যোগ

ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্যবিষয়ক বাংলা জাতীয় মাসিক পরওয়ানার ব্যাপক প্রচার-প্রসার এবং পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা ভিত্তিক পাঠক ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি মাসিক পরওয়ানার সম্পাদক মাওলানা রেদওয়ান আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সভায় সম্পাদক বলেন, মাসিক পরওয়ানা মানুষের অন্যতম প্রিয় একটি পত্রিকা। এর প্রচার-প্রসার আরও বিস্তৃত করতে, পাশাপাশি বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পত্রিকাটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন পরওয়ানা পাঠের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও মননের বিকাশ ঘটাতে পারে, সে লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি । তিনি আরও বলেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিয়মিত পত্রিকা পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে পাঠক ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উপজেলা ভিত্তিক এ উদ্যোগের মাধ্যমে পাঠকদের সঙ্গে পত্রিকার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং পরওয়ানার কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১০ অক্টোবর, শনিবার, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় ২১ সদস্যবিশিষ্ট, ১৯ অক্টোবর, সোমবার, শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট ও ২১ অক্টোবর, বুধবার, ওসমানীনগর উপজেলায় ২৯ সসদস্যবিশিষ্ট পরওয়ানা পাঠক ফোরাম গঠন করা হয়েছে। চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে সিলেট বিভাগের সবকটি উপজেলায় পাঠক ফোরাম গঠনের কথা রয়েছে।

বাংলাদেশ-জাপান বৈঠক : জ্বালানি, প্রযুক্তি ও সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বারোপ

জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা জোরদারে একমত হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দুই নেতার দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকে এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে জাপান সরকার ও দেশটির বেসরকারি খাতকে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশিল্পের কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশটি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার অভিন্ন আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে জাপানের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি। এশিয়ায় জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে পার্টনারশিপ ফর পাওয়ার এশিয়া উদ্যোগের আওতায় সাম্প্রতিক ৫০ বিলিয়ন জাপানি ইয়েনের জরুরি সহায়তা ঋণের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) অবকাঠামো, দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে জাপানি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান তারেক রহমান।

মেট্রোরেল প্রকল্পে ৪৬ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্পের লাইন-১ ও লাইন-৫-এর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। এর মধ্যে লাইন-১ এর চারটি এবং লাইন-৫ এর একটি, পাশাপাশি লাইন-১-এর আরও দুটি এবং লাইন-৫ উত্তর রুটের একটি প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। লাইন-১ এর সিপি-০৬ প্যাকেজের আওতায় ৫ দশমিক ১৮২ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পথ নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে দুটি ৪ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ ও তিনটি ভূগর্ভস্থ স্টেশন থাকবে। এ ছাড়া টিবিএম চালুর জন্য শ্যাফট নির্মাণ করা হবে। এ কাজে ভ্যাট ও করসহ ব্যয় হবে ১১ হাজার ৫৯০ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। লাইন-১ এর সিপি-০৯ প্যাকেজে ট্র্যাক নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক সুবিধা স্থাপন করা হবে। এ কাজে ব্যয় হবে ১১ হাজার ৬৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। সিপি-১০ প্যাকেজে থাকবে সংকেত ও টেলিযোগাযোগব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের পর্দা-দরজা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। এ কাজে ব্যয় ৬ হাজার ৪৪৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা । লাইন-১-এর সিপি-০২ প্যাকেজে ডিপোর ওয়ার্কশপ, স্টাবিলিং শেড, অপারেশন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, কারিগরি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন উপকেন্দ্র ও ট্র্যাক নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ভ্যাট ও করসহ ৪ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা। লাইন-৫-এর সিপি-০৩ প্যাকেজে ৫ দশমিক ৬ কিলোমিটার এবং নতুনবাজারের পর থেকে ০ দশমিক ৯ কিলোমিটারসহ মোট ৬ দশমিক ৫০ কিলোমিটার উড়ালপথ নির্মাণ করা হবে। হেমায়েতপুর, বলিয়ারপুর, বিলামালিয়া, আমিনবাজার ও ভাটারায় পাঁচটি উড়ালস্টেশনও হবে। এ কাজে ব্যয় হবে ২ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা।

অমর একুশে বইমেলা শুরু জানুয়ারিতে

ভাষা শহীদদের স্মরণে আয়োজিত মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা-২০২৭ শুরু হবে আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলা একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অমর একুশে বইমেলা ২০২৭ আয়োজন বিষয়ে প্রকাশক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মত-বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান ও মন্ত্রণালয়ের সচিব ইয়াসমিন বেগম। সভায় প্রকাশক-প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আগামী ৭ জানুয়ারি ২০২৭ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অমর একুশে বইমেলার সময় নির্ধারিত হয়।

আলিম ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক আলিম ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ৩১ অক্টোবর বেলা ১১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ফলাফল নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ও অনলাইনে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক আলিম ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৫২ দশমিক

১২ শতাংশ। ২০২৫ সালের পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৮৩। অর্থাৎ গতবারের চেয়ে পাসের হার ৬ দশমিক ৭১ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে এক বছর পর আবার পরীক্ষায় বসতে হয়। একটি বা দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার কারণেও একজন শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া পরীক্ষার্থীরা এক মাসের মধ্যে কেবল ফেল করা বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এবার এক ও দুই বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থী ৪ লাখ ২২ হাজার ৯০৫ জন। ২০২৫ সালের তুলনায় এবছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেছে ৩২ হাজার ৯২। ২০২৫ সালে পুনর্নিরীক্ষণের পর ৭২ হাজার ১৭৬ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৮৪ জন। এক বছরের ব্যবধানে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এ বছর ১২ লাখ ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৫ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৮৪ জন। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ২০ হাজার ৩৬৩ জন এবং ছাত্রী ১৯ হাজার ৭২১ জন।

আন্তর্জাতিক

ইউরোপজুড়ে বিক্ষোভ

জীবনযাত্রার ব্যয় ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশে নির্বাচনের আগে কট্টর ডানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো নতুন করে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা ও সরকারি ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাওয়া ইউরোপীয় সরকারগুলোর ওপরও চাপ বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ জ্বালানির দাম বাড়িয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উত্তর উপকণ্ঠে স্কুলের অবকাঠামোর অবনতি নিয়ে শুরু হওয়া বিক্ষোভ পরে ব্যাপক সহিংসতায় রূপ নেয়। কয়েক দশকের মধ্যে দেশটির অন্যতম গুরুতর অস্থিরতার এ ঘটনায় দোকানপাটে লুটপাট, ভবনে অগ্নিসংযোগ এবং লিমোজ শহরের ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি টাউন হল পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর মিলানেও জীবনযাত্রার ব্যয় ও সরকারি সেবার মান নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পাথর নিক্ষেপ এবং দোকানপাটে লুটপাটের ঘটনা ঘটে। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনেও কম মজুরি, আবাসন ব্যয় ও জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল করেন। এতে দেশটির মধ্য-ডানপন্থি সরকারের ওপর চাপ বেড়েছে। এ ছাড়া স্পেন, বেলজিয়াম ও আলবেনিয়ায়ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসব বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ইউরোপজুড়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগ।

আরব আমিরাতের উপকূলে ছড়িয়ে পড়ছে তেলের আস্তরণ

ট্যাংকারে হামলার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলে তেলের আস্তরণ দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি সৈকতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। ক্ষতিকারক এই তেলের প্রবাহ আমিরাতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য উম্ম আল-কুওয়াইনের উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।গত শুক্রবার আমিরাতের পরিবেশ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, তেল যেন আরও ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য দুর্ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকায় জোর উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে ঠিক কী কারণে বা কীভাবে এই লিকেজের সূত্রপাত হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, গত মাসে এক অজ্ঞাত মিসাইল বা ড্রোনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত তেলবাহী ট্যাংকার 'জেম নম্বর ২' থেকেই সম্ভবত এই তেলের নিঃসরণ ঘটছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সংঘাত ও উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পারস্য উপসাগরে একের পর এক বাণিজ্যিক ও জ্বালানিবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটছে। বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবাদীদের মতে, এর ফলে সমুদ্রের পরিবেশ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর এক চরম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ইসরায়েলে সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না

ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ভোট গণনা শেষ হয়েছে। তবে সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। ১২০ আসনের নেসেটে কোনো পক্ষই এককভাবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬১ আসন পায়নি। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের লক্ষ্যে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন নেতানিয়াহুবিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতারা। তবে আরব দলগুলোর সঙ্গে জোটে যাওয়ার প্রশ্নে বিরোধী শিবিরে এখনো মতপার্থক্য থাকায় সরকার গঠনের পথ বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলে দেখা গেছে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী জোট পেয়েছে ৫৩ আসন। এরমধ্যে তার নিজের দল লিকুদ পার্টি পেয়েছে ২৭ আসন। অন্যদিকে নেতানিয়াহুবিরোধী শিবির পেয়েছে ৪৮ আসন। আরব জোট ও দল জয়েন্ট লিস্ট এবং রাআম পেয়েছে ১৯ আসন। এই দুই দলের সমর্থন পেলে বিরোধী পক্ষের সম্ভাব্য আসনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬৭টিতে, যা সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে বেশি। এবারের নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোটার উপস্থিতি ছিল ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ, যা কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। সরকার গঠনের পথে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছে আরব দলগুলোর সঙ্গে জোট নিয়ে বিরোধীদের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য। ইয়াহুদী নেতৃত্বাধীন বিরোধী চার দলের মধ্যে তিন দল ইয়াশার, বিয়াচাদ ও ইসরায়েল বেইতেনু আরব দলগুলোকে নিয়ে জোট সরকার গঠনে আগ্রহী নয়। ফলে আরব দলগুলোর ১৯ আসন যুক্ত করে সম্ভাব্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৬৭ হলেও বাস্তবে সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না। নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ ঘিরেও রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। নেতানিয়াহু ও তাঁর দল লিকুদ সমন্বিতভাবে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচার চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ডিন লিভনেও ব্যাপক নির্বাচনী জালিয়াতির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, নির্বাচন আইন মেনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভোটের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হওয়ার মতো কোনো প্রমাণ মেলেনি।

কবিতা

আল্লামা ইকবাল (র.)-এর কবিতা

১
হে বিশ্বাসী তরুণ
কখনও কি চিন্তা করেছ গভীর ও গুরুতর বিষয় নিয়ে?
এই পৃথিবীটা আসলে কী?
যেখানে তুমি শুধুই একটি বিচ্ছিন্ন তারা

এমন অনেক একাকী নক্ষত্রের উপর
নির্ভর করে কোনো দেশের ভবিষ্যৎ
দেশ কখনও এগোতে পারে না
যদি না সে তার প্রত্যেক তরুণকে
পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেয়
কাজে লাগায় পৃথক-প্রতিভাকে

একেকটি তরুণ একেকটি উদীয়মান নক্ষত্র
তাদের হাতেই রাষ্ট্রের নিয়তি
যদি তারা পরিপূর্ণ পুষ্টি পায়
তবেই পরিপক্ক হয় দেশ।

২
একজন তরুণ একা কিছুই করতে পারে না
যদি না রাষ্ট্র পাশে থাকে তার
বিচ্ছিন্ন নক্ষত্র মিলেই তৈরি হয়
অপূর্ব আলোর সমাহার

দেশের ভবিষ্যৎ কী, তা কেউ জানে না
কিন্তু চারদিকে—অজস্র নিদর্শন
হে তরুণ জেগে ওঠো, বাঁচাও এ দেশ
উদাসীন যদি থাকো তবে নিশ্চিত পতন

হৃদয়কে করো ইস্পাতের মতো কঠিন
আস্থা রাখো নিজের উপর, ভাই
যদি আসে যুদ্ধ আবার, কলম ধরো—
তরবারির কোনো প্রয়োজন নাই।

বাজপাখির নেই ওড়ার কোনো ক্লান্তি
কিংবা কখনও লুটিয়ে পড়ে না মাটিতে
পরিশ্রান্ত দুডানায় কী যে শক্তি
সঞ্চার করে ছোটে ক্ষিপ্র গতিতে

শিকারির ভয়ে কখনো সে
বন্ধ করে না ওড়া
পুরো পৃথিবী-ই গৃহ তার
রাজত্ব আকাশ জোড়া

পাখির মতো স্বাধীন হও
আকাশের মতো উন্মুক্ত
সাহসী হৃদয়ে নীরবে ফলাও
ভালোবাসার মুক্তো

ফররুখ আহমদ-এর কবিতা

ঝরোকা

সকল রুদ্ধ ঝরোকা খুলে দাও
খুলে দাও সকল রুদ্ধ দরোজা
আসুক সাত আকাশের মুক্ত আলো
আর উচ্ছল আনন্দের মত
বাগে এরেমের এক ঝাঁক মৌমাছি.....
যেন এই সব পাথরের ফুলের মাঝখান থেকে
আমি চিনে নিতে পারি
রক্তমনির চেয়েও লাল সুনভিত
একটি তাজা রক্ত গোলাপ;
আমার ব্যথিত আত্মা আর্তনাদ করে উঠলো
দাউদের পুত্র সুলাইমানের মতো
কেননা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আকাশ আছে পৃথিবীতে
চিরন্তন শুধু সত্যের অন্বেষা।





অভিশপ্ত কালোবাড়ি

ফজলে হাসান চৌধুরী সিজান

১. যে রাতে চাঁদ হারিয়ে যায়

রাত তখন গভীর। ঘড়ির কাঁটা বারোটা অতিক্রম করেছে। চারদিকে নিস্তব্ধতা। আকাশে চাঁদের কোনো অস্তিত্ব নেই। অমাবস্যার ঘন কালো অন্ধকার যেন গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছে। দূরের বাঁশঝাড় থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক। মাঝেমধ্যে শিয়ালের হুক্কাহুয়া শব্দ রাতের নীরবতাকে আরও ভয়ংকর করে তুলছে। গ্রামের নাম শ্যামপুর। ছোট্ট একটি গ্রাম। চারদিকে সবুজ মাঠ, পুকুর, গাছপালা আর আঁকাবাঁকা মেঠোপথ। দিনের আলোয় গ্রামটি যতটা সুন্দর, রাতের অন্ধকারে ঠিক ততটাই রহস্যময়। তবে গ্রামের মানুষের কাছে রাতের অন্ধকারের চেয়েও ভয়ংকর একটি বিষয় ছিল–অমাবস্যা। কারণ, শ্যামপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি বহু পুরোনো পরিত্যক্ত জমিদারবাড়ি। বাড়িটির আসল নাম কেউই জানে না। গ্রামের মানুষ একে ডাকে 'কালোবাড়ি' নামে। বাড়িটি দেখতে সাধারণ কোনো পরিত্যক্ত বাড়ির মতো নয়। বিশাল লোহার ফটক, উঁচু দেয়াল, ভাঙা বারান্দা, কালচে হয়ে যাওয়া জানালা আর দোতলার ছাদে জন্ম নেওয়া বুনো গাছপালা–সব মিলিয়ে বাড়িটিকে দূর থেকে দেখলেও বুকের ভেতর অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে রাতের বেলায় বাড়িটির দিকে তাকালে মনে হয়, অন্ধকারের ভেতর কেউ যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের বয়স্কদের মুখে শোনা যায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই বাড়িতে এক প্রভাবশালী জমিদার পরিবার বসবাস করত। পরিবারের কর্তা ছিলেন জমিদার হরিশংকর রায়। তার স্ত্রী, একমাত্র ছেলে এবং পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য নিয়ে ছিল তাদের সংসার।

কিন্তু ১৯৭৬ সালের এক অমাবস্যার রাতে ঘটে যায় এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেই রাতেই পরিবারের সবাই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরদিন সকালে গ্রামের লোকজন বাড়িতে প্রবেশ করে দেখতে পায়, ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো হয়ে আছে। দেয়ালের আয়না ভাঙা। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে রক্তের মতো লাল কিছু দাগ। রান্নাঘরে তখনো চুলার আগুন জ্বলছিল। খাবারের থালা সাজানো ছিল খাবার টেবিলে। কিন্তু বাড়িতে একজন মানুষও ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বাড়ির প্রধান দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কেউ কীভাবে বের হলো? কোথায় গেল পুরো পরিবার? এত বড় বাড়িতে একটি মৃতদেহও পাওয়া গেল না কেন? কেউ কোনো উত্তর দিতে পারেনি। এরপর থেকেই বাড়িটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটির চারপাশে জন্ম নেয় ঘন জঙ্গল। লোকজন বাড়ির কাছ দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দেয়।

তারপর শুরু হয় অদ্ভুত সব ঘটনা। কেউ বলে, গভীর রাতে বাড়ির দোতলা থেকে নারীর কান্না শোনা যায়। কেউ বলে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সাদা পোশাকের একটি ছায়ামূর্তি। আবার কেউ দাবি করে, রাত ঠিক বারোটায় বাড়ির ভেতর থেকে শিশুর হাসির শব্দ আসে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা হলো, যারা অমাবস্যার রাতে বাড়িটির ভেতরে প্রবেশ করেছে, তাদের অনেকেই আর কখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেনি।

২. রহস্যে অবিশ্বাসী রাশেদ

শ্যামপুর গ্রামেরই এক যুবক রাশেদ। বয়স প্রায় ছাব্বিশ। পড়াশোনা শেষ করে গ্রামের বাড়িতেই থাকত। সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং কিছুটা জেদি স্বভাবের ছেলে। ভূত-প্রেত, জিন-পরীর গল্প শুনলে সে হেসে উঠত। তার কাছে পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার পেছনে কোনো না কোনো বাস্তব কারণ রয়েছে। রাশেদের বিশ্বাস, মানুষ যখন কোনো



ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না, তখনই সেটিকে অলৌকিক বলে চালিয়ে দেয়। একদিন বিকেলে গ্রামের বাজারের চায়ের দোকানে বসে কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল সে। কথায় কথায় কালোবাড়ির প্রসঙ্গ উঠল। বৃদ্ধ করিম মিয়া চায়ের কাপ নামিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বাবা রাশেদ, তুই লেখাপড়া জানা ছেলে। কিন্তু সবকিছু বই দিয়ে বোঝা যায় না। কালোবাড়ির রহস্য নিয়ে বেশি মাথা ঘামাস না। রাশেদ হেসে বলল, চাচা, একটা বাড়ি পঞ্চাশ বছর ধরে খালি পড়ে আছে। সেখানে বাতাস ঢুকলে শব্দ হবে, ইঁদুর চললে শব্দ হবে। এই নিয়ে এত ভয়ের কী আছে? করিম মিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুই জানিস, ১৯৮৯ সালে আমার বড় ভাই ওই বাড়িতে গিয়েছিল?

-তারপর?

-সে আর ফিরে আসেনি।

রাশেদ অবাক হয়ে বলল, তাহলে পুলিশে খবর দেননি?

বৃদ্ধ করিম মিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খবর দিয়েছিলাম। পুলিশ এসেছিল। বাড়ির প্রতিটি ঘর খুঁজেছিল। কিন্তু কাউকে পায়নি। শুধু দোতলার একটি ঘরে আমার ভাইয়ের জুতা পাওয়া গিয়েছিল। অথচ সে জুতা পরে বাড়িতে ঢুকেছিল। রাশেদ হেসে বলল, চাচা, আপনার ভাই হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ এবার রাশেদের চোখের দিকে তাকালেন। তাহলে একটা কথা বল। তোর ভাই যদি হারিয়ে যায়, তুই কি তার জুতা ফেলে রেখে বাড়ি থেকে চলে যাবি?

রাশেদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বলল, একদিন আমি নিজেই ওই বাড়িতে যাব। সব রহস্য বের করে আনব। করিম মিয়া এবার কাঁপা কণ্ঠে বললেন, যাবি, কিন্তু মনে রাখিস–ওই বাড়িতে কেউ একা যায় না। আর অমাবস্যার রাতে তো কখনোই না।

৩. অমাবস্যার আহ্বান

সেদিন ছিল অমাবস্যা। বিকেল থেকেই আকাশের অবস্থা অস্বাভাবিক। সূর্য ডোবার আগেই চারদিকে কেমন যেন অন্ধকার নেমে এসেছিল। সন্ধ্যার পর বাতাস থেমে যায়। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়ছিল না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষ ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়।

রাত সাড়ে দশটা। রাশেদ তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ সে কালোবাড়িতে যাওয়ার কথা তোলে। বন্ধু সোহেল বলল, আজই যাবি? হ্যাঁ। আজ অমাবস্যা। রহস্যের পরীক্ষা করার জন্য এর চেয়ে ভালো রাত আর কী হতে পারে? আরেক বন্ধু জসিম বলল, দোস্ত, এসব বাদ দে। দিনের বেলায় গেলেই তো হয়। রাশেদ হেসে উঠল। দিনের বেলায় গেলে আবার ভূতের দেখা পাব কীভাবে? সবাই হাসলেও সোহেল হাসতে পারল না। সে বলল, তুই একা গেলে যাবি, কিন্তু আমাদের কাউকে দোষ দিবি না। রাশেদ বাজি ধরল, সে কালোবাড়িতে ঢুকে একটি ভিডিও ধারণ করে আনবে। ভিডিওতে কিছুই না পেলে গ্রামের মানুষ আর কখনো ভূতের গল্প নিয়ে তাকে বিরক্ত করতে পারবে না।

রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। রাশেদ মোবাইলের টর্চ, একটি ছোট ছুরি এবং পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলো। বাড়ির উঠানে পা রাখতেই তার মনে হলো, কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ডাকলো–"রাশেদ...!"

সে ঘুরে তাকাল। কিন্তু কেউ নেই। সে আবার হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার সেই ডাক–"রাশেদ...! দাঁড়াও...!" এবার কণ্ঠটি যেন কোনো নারীর। রাশেদ থেমে চারদিকে তাকাল। দূরে একটি পুরোনো বটগাছের নিচে সাদা কিছু একটা নড়তে দেখল। সে মোবাইলের আলো ফেলতেই সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজেকে বোঝাল, নিশ্চয়ই কোনো কাপড় বাতাসে উড়ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তখন মোটেও বাতাস ছিল না! *(বাকি অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)*

মতোর পুরস্কার

রাহাত নামে এক দরিদ্র ছেলে একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করত। তার বাবা ছিলেন একজন কৃষক। অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতেন। রাহাত গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী ও সৎ। একদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাহাত রাস্তার পাশে একটি কালো রঙের ব্যাগ কুড়িয়ে পেল। ব্যাগটি হাতে নিয়ে সে খুলে দেখল, ভেতরে অনেক টাকা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং একটি পরিচয়পত্র রয়েছে। টাকাগুলো দেখে তার মনে নানা চিন্তা আসতে লাগলো। কারণ, কয়েকদিন ধরে তার মা অসুস্থ। মায়ের ওষুধ কেনার জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। রাহাত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একদিকে মায়ের চিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যদিকে অন্যের সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অন্যায়। কী করবে সে? এমতাবস্থায় রাহাত সিদ্ধান্ত নিলো.....

(রাহাত কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? নিজের কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে গল্পটির বাকি অংশ লেখো এবং একটি উপযুক্ত নীতিবাক্য দিয়ে গল্পটি শেষ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। সেরা লেখকের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার)

গল্প পূর্ণ কর...

ইতিহাস পড়ে তৃপ্ত সবাই----------
অথচ আকসা রুদ্ধ ফের
ছিন্নভিন্ন উম্মার হাল
ঐক্য গড়েছে সব কাফের!

ছড়া/কবিতা পূর্ণ কর...

[সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (র.)-এর বীরত্বগাথা ইতিহাস পড়েই আমরা এখন তৃপ্ত হই। অথচ যেই আকসাকে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী মুক্ত করেছিলেন সেই আল আকসা এখন আবারও অবরুদ্ধ। ঐক্যবদ্ধভাবে বীর সালাহউদ্দীনেরন পথ অনুসরণ করে আল আকসাকে মুক্ত করার কথা ছিলো যে উম্মাহর, যে উম্মাহ একটি দেহের মত থাকার কথা, সেই উম্মাহ এখন বহু দল উপদলে বিভক্ত, অন্যদিকে কাফির শক্তি আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।]
এটি উপরের ৪ লাইনের ব্যাখ্যা। আবারও মুসলমানদের একতাবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে ছন্দ, মাত্রা ঠিক রেখে আরও ৮ অথবা ১২ লাইন যুক্ত করে পাঠিয়ে দাও আর জিতে নাও আকর্ষণীয় পুরস্কার।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
parwanaafbd@gmail.com 01799 629090

গত সংখ্যায় যাদের পূর্ণ করা গল্প নির্বাচিত হয়েছে [প্রথমজন পুরস্কৃত]

খন্দকার তাহমিদ জাহান মাহদী, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, জকিগঞ্জ, সিলেট # খুবায়েব আহমেদ, লালাবাজার ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা # মুক্তার হোসেন # মো. আশরাফুল ইসলাম, লতিফিয়া কমপ্লেক্স # সাইদুর রহমান, দারুল আরকাম মাদরাসা।

গত সংখ্যায় যাদের পূর্ণ করা ছড়া নির্বাচিত হয়েছে [প্রথমজন পুরস্কৃত]

মুহাম্মদ আল আমান # তায়েফ আহমদ # হেমায়েত উল্লাহ # সঞ্জব চৌধুরী।

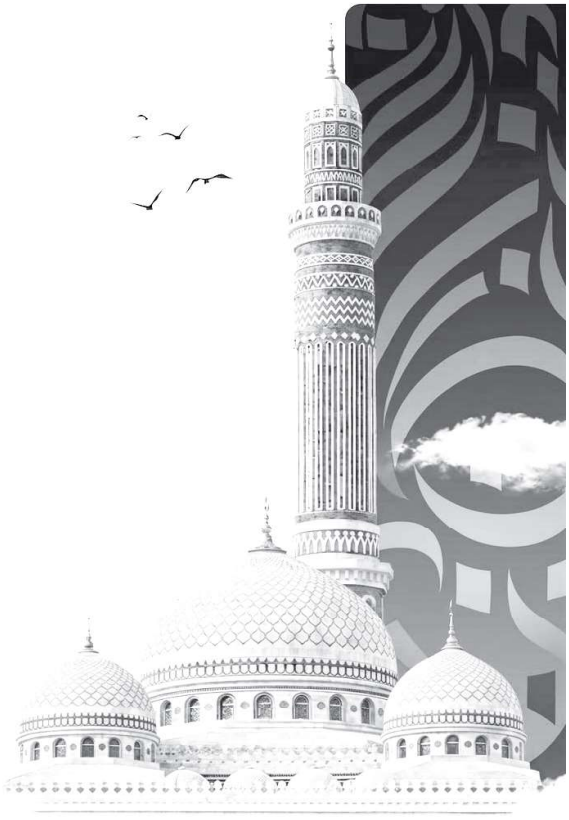

ফজরের আভা

খন্দকার তাহমিদ জাহান মাহদি

গত সংখ্যার নির্বাচিত গল্প

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে। ট্রেনের শব্দে ঘুম ভাঙলো নাদিমের। গতরাতও ফজরের সময় ট্রেন চলছিল। পাশের রুমে মামা ঘুম থেকে উঠেছেন। নড়াচাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরের কোন মসজিদে ইমাম সাহেব দুআ-দুরূদ পড়ছেন। মামা রুমের বাতির সুইচ অন করলেন। নাদিম বলল, মেজো মামা, দরজা খোলা আছে। মসজিদে যাবেন? মামা বললেন, তৈরি হও। উযূ করে টর্চলাইট হাতে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে মতি মিয়ার সাথে দেখা। মসজিদে যাওয়ার আগে তার ছোট ঘর। মতি মিয়া, কয় মিনিট দেরি? দুই মিনিটের মধ্যে ট্রেন চলে আসবে। এক মিটার প্রস্থের রেল পথ দুই সেকেন্ডে পাড়ি দেওয়া যায়। মামা নাদিমের হাত ধরে রেলগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিকট বজ্রধ্বনি ও লোহার পাতের শব্দ। ট্রেনটি খুব দ্রুত পার হল। মামা বললেন, চলো।

আজ মসজিদে মুয়াযযিন সাহেব নেই। ইমাম সাহেব ছুটিতে গেলে মতি মিয়া মুয়াযযিন ও মামা হন মসজিদের ইমাম। মতি মিয়া তার ভরাট সুরে আযান দিতে শুরু করলেন। চতুর্দিক মুখরিত হতে লাগলো আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার.....

আযান শেষ হলে নাদিম ও তার মামা ফজরের দুই রাকআত সুন্নত নামায আদায় করে নিলেন। তারপর নাদিম, তার মামা ও পাড়ার অন্যান্য মানুষ জামাআতের অপেক্ষা করতে লাগলেন, ৫:১৫ মিনিটে মতি মিয়া ইকামত দিতে শুরু করলেন, জামাআত শুরু হলো। স্নিগ্ধ-মনোরম পরিবেশে নামাযে মামা সূরা আর-রাহমান তিলাওয়াত করলেন। যথাযথভাবে নামায শেষ হলো। নামায শেষে নাদিম তার মামা ও মতি মিয়া মসজিদের বারান্দায় এসে বসলেন। মামা ও মতি মিয়া সূরা ইয়াসিন পড়তে শুরু করলেন, তাদের দেখাদেখি নাদিমও পড়তে শুরু করল। শেষ করার পর নাদিম তার মামাকে জিজ্ঞেস করলো, এখন সূরা ইয়াসিন পড়লে কী হয়? মামা নাদিমকে যারা ইয়াসিনের একটি ফদীলতের কথা বললেন- রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পর সূরা ইয়াসিন পড়বে সে ব্যক্তির সকল প্রকার অভাব দূরীভূত হয়ে যাবে। নাদিম সূরা ইয়াসিনের ফদীলতের কথা শুনে তার অন্তরে প্রতিদিন ইয়াসিন পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। তারপর তারা সবাই বাড়ির পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটার সময় প্রকৃতির মনোরম পরিবেশ তাদেরকে মুগ্ধ করে তুললো। প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশটাকে আরও বেশি উপভোগ করার জন্য নাদিমের মামা বললেন, চলো আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে বসি। তখন মতি মিয়া বললেন, তোমরা যাও, বাড়িতে আমার অনেক কাজ আছে । মতি মিয়াকে নাদিম ও তার মামা বিদায় দেওয়ার পর তারা নদীর পাড়ে এসে বসলেন। নদীর কলকল ধ্বনি তাদের মনকে আরো তৃপ্ত করে তোলে। নাদিম ও তার মামা সেখানে কিছুক্ষন বসার পর বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলেন। তারা গল্প করতে করতে বাড়িতে আসলেন। বাড়িতে আসার পর মামা নাদিমকে বললেন কুরআন শরীফ নিয়ে আসো, তারপর মামা নাদিমকে কিছুক্ষন কুরআন শরীফ মশক দিলেন। শেষ হওয়ার পর নাদিমের হঠাৎ মনো হলো- তার একটি হাদীস মুখস্ত বাকি রয়েছে। তারপর নাদিম খুব তাড়াতাড়ি হাদীসটি মুখস্ত করে ফেললো। তারপর নাদিম নাশতার টেবিলে গিয়ে দেখলো আজ তার প্রিয় খাবার পায়েস রান্না করা হয়েছে। তা দেখে নাদিম অনেক খুশি হয়। নাশতা করার পর নাদিম মাদরাসার বই নিয়ে পড়তে বসে। সামনের মাসে তার পরীক্ষা।



কে বলেছে মরছে ওরা
জিতছে তারা রাত্রি দিন
হাসতে হাসতে শাহাদাতে
লুটায় গাযা-ফিলিস্তিন

তাদের নামটা ইতিহাসে
থাকবে সত্য বহুকাল
জীবন যাচ্ছে তবুও তারা
নয়তো রাযী ছাড়তে হাল

খালি পেটেই লড়ছে তারা
গুলি খেয়েই যাচ্ছে দিন
শহীদ হওয়ার ইতিহাসটা
গড়ছে দেখো ফিলিস্তিন

-মোহাম্মদ আল আমান

গত সংখ্যার নির্বাচিত ছড়া

গত পর্বের পর...

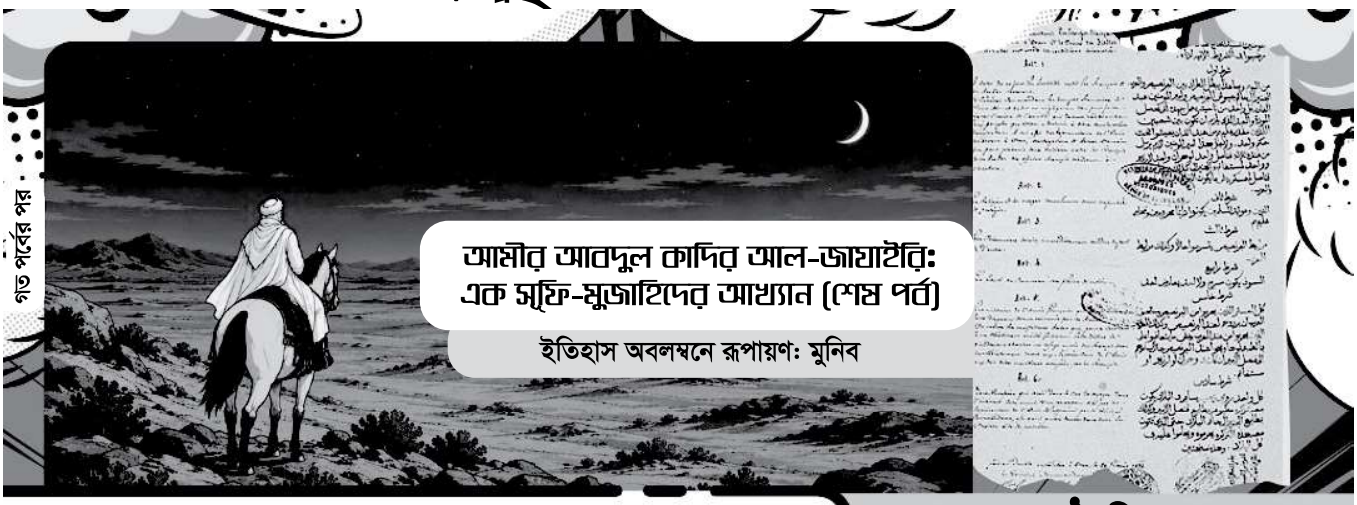

আমীর আবদুল কাদির আল-জাযাইরি: এক সূফি-মুজাহিদের আখ্যান (শেষ পর্ব)

ইতিহাস অবলম্বনে রূপায়ণ: মুনিব

১২ ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে। আধিপত্যবাদী ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রান্স হতে লোক এনে আলজেরিয়ায় স্থায়ী বসতির মাধ্যমে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের একটি স্থায়ী অংশে পরিণত করা। ফরাসিরা সংখ্যায় খুব স্বল্প হলেও আলজেরিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের একচেটিয়া দখলে ছিল। এই দখলদারিত্ব ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। দখলদার ফরাসি বাহিনীর প্রচণ্ড নির্মমতা ও যুলুমের বিরুদ্ধে আলজেরিয়াবাসী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এতে দখলদার বাহিনী দেসমিশেলস ও তাফনা চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

১৩ দসমিশেলস (১৮৩৪) ও তাফনা (১৮৩৭) সন্ধি চুক্তিদ্বয়ের ফলস্বরূপ, ফ্রান্স আমীর আব্দুল কাদিরকে আলজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন সার্বভৌম শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।তাফনা চুক্তির পর শান্তির সময়কাল উভয় পক্ষকে উপকৃত করে। আমীর তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রকে গড়ার সুযোগ নেন।



১৪ তিনি তাঁর অঞ্চলকে আটটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন, প্রতিটি অঞ্চল খলীফা দ্বারা পরিচালিত হত; প্রতিটি অঞ্চল জেলায় বিভক্ত ছিল, যার নেতৃত্বে আঘা ছিলো; প্রতিটি জেলায় বেশ কয়েকটি উপজাতি ছিল, যার প্রত্যেকটির নেতৃত্ব দিত একজন কায়িদ। আমীর প্রতিটি অঞ্চলকে দর্জি, অস্ত্রশস্ত্র এবং জিনসাজ (অশ্বারোহীদের সরঞ্জাম তৈরি ও মেরামতের দক্ষ কারিগর) সরবরাহ করেছিলেন। তিনি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিচারক (কাযী) নিয়োগ করেন।

১৫ তিনি অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন যেখানে শিশুদের ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির পাশাপাশি কীভাবে পড়তে এবং লিখতে হয় তা শেখানো হতো।

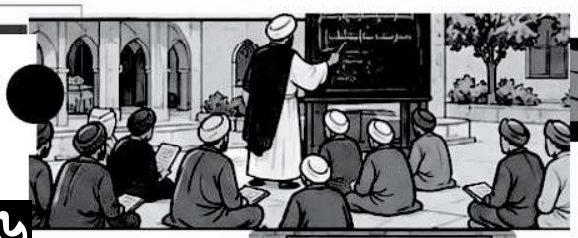



১৬ তিলিমসানে কামান কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শহরগুলিতে, অস্ত্রাগার, কর্মশালা এবং গুদামঘর স্থাপন করেন। যেখানে তিনি অস্ত্র কেনা ও বিক্রি করার জন্য কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতেন। তাঁর নিজস্ব মুদ্রা মুহাম্মদিয়াও ছিল।



১৭ তিনি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সমর্থনে প্রায় ৮,০০০ পদাতিক সৈন্য, ২,০০০ অশ্বারোহী এবং ২৪০ জন আর্টিলারিম্যান নিয়ে একটি নিয়মিত বাহিনীও গঠন করেন।



১৮ শান্তির অবসান ঘটে যখন ফরাসি বাহিনী তাফনা চুক্তির শর্তাবলি ভঙ্গ করে, একটি বাহিনী (১৮৩৯সালে) আমীরের প্রশাসনিক অঞ্চলে প্রবেশ করে। ফলস্বরূপ, তিনি ২০ নভেম্বর, তাঁর খলীফাদের আহ্বানে ফরাসিদের আক্রমণ করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফরাসিরা আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯ ১৮৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনারেল বুজো গভর্নর-জেনারেল হয়ে আলজেরিয়ায় ফিরে আসেন; তাঁর সঙ্গে আসে ২৫,০০০ নতুন সৈন্য, যার ফলে ফরাসি বাহিনীর শক্তি ৮৫,০০০-এ পৌঁছে যায়।
এবার বুজোর কৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন: তার পদ্ধতি ছিল পোড়া-মাটি নীতি ।



২০ সাহসী আব্দুল কাদির প্রায় সমগ্র আলজেরিয়াকে একত্রিত করে, প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। আমীর প্রমাণ করেন যে, হাতের তাসবীহ খাপবদ্ধ তলোয়ারকে দুর্বল করে না। তাঁর নিরলস ও বহুমুখী প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৮৩০-১৮৪৭) ফ্রান্সকে পুরো সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ আলজেরিয়ায় মোতায়েন করতে বাধ্য করে। তবুও বছরের পর বছর ধরে তারা তাকে বশীভূত করতে পারেনি।



২১ জামালাহ (স্মালা) ভ্রাম্যমাণ রাজধানী;
পাথরের দুর্গে লুকিয়ে থাকা ইউরোপীয় রাজাদের বিপরীতে, আমীর আবদুল কাদির লজিস্টিক্সের একটি অনন্য বিস্ময় তৈরি করেছিলেন যা স্মালা বা জামালাহ নামে পরিচিত। এটি একটি ভ্রাম্যমাণ রাজধানী ছিল - পরিবার, কারিগর, গবাদি পশু এবং এমনকি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সহ ৩০,০০০ এরও বেশি লোকের একটি শহর। যখনই ফরাসি বাহিনী এগিয়ে আসত, স্মালা বিশাল মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যেত। এটি এমন একটি কৌশল ছিল যা বছরের পর বছর ধরে ইউরোপীয় জেনারেলদের বিস্মিত করে রেখেছিল।

২২ আব্দুল কাদিরের গেরিলা পদ্ধতির প্রতিশোধ নিতে ফ্রান্স অনেকগুলো ভয়াবহ ঘটনা ঘটায়। আমীরের সমর্থক জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে এবং তাদের ফ্রান্সের পক্ষে আনতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বুজো ফরাসি বাহিনী দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় হানা দেয়, গ্রাম ও ফসল জ্বালিয়ে দেয়, কৃষিজমি ধ্বংস করে এবং গবাদিপশু লুট করে। যুদ্ধ ও আগ্রাসনের সময় আলজেরীয় নারীদের শরীর থেকে গহনা ছিনিয়ে নেওয়া, কানের দুল টেনে কান ছিড়ে ফেলা এবং নারীদের চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করার অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।



২৩ ১৮৪৫ সালের জুনে এক গোত্রের ৫০০-এরও বেশি পুরুষ, নারী ও শিশু লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমাবল পেলিসিয়েরের সৈন্যদলের তাড়া খেয়ে দাহরা পর্বতমালার একটি গুহায় আশ্রয় নেয়।
তাদের আত্মসমর্পণে ব্যর্থ হওয়ার পর দখলদার বাহিনী ডালপালা দিয়ে গুহার প্রবেশপথ বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেয়; এতে গুহা ধোঁয়ায় ভরে যায় এবং আগুনে পুড়ে ও শ্বাস বন্ধ হয়ে প্রায় সবাই শহীদ হয়। ফরাসি বাহিনী এরকম একাধিক গনহত্যায় জড়িত ছিল।

২৪ ১৮৪৩ সালে আমীর একটি অভিযানে ছিলেন তখন তাঁর জামালাহ শেষ পর্যন্ত আকস্মিক আক্রমণের কবলে পড়ে যায়। যার মধ্যে ছিল তাঁর যুদ্ধ-তহবিল এবং ৫,০০০ পাউন্ড মূল্যের একটি গ্রন্থাগার।আমীরের পরিবার ও হাজার হাজার অনুসারী গ্রেফতার হয়। এটি ছিল আমীরের জন্য বিধ্বংসী লজিস্টিক আঘাত যা যুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট বদলে দেয়।



২৫ আলজেরিয়ার জনগণের উপর ফরাসি বাহিনীর নিদারুণ যুলম নির্যাতন ও জামালাহ হারিয়ে আমীর নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য মরক্কোতে চলে যান। কিন্তু মরক্কোর শাসক ফ্রান্সের চাপে আমীরকে ধোকা দিলে তিনি ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করে পুনরায় আলজেরিয়া ফেরত আসেন।



২৬ চুক্তিতে শর্ত ছিল যে, তাকে এবং তার অনুসারীদের সম্মানজনকভাবে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া অথবা ফিলিস্তিনের আকা অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠানো হবে। তবে ফরাসি সরকার এই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠানোর পরিবর্তে ফ্রান্সের টুলন দুর্গে বন্দি করে রাখে, যেখানে তিনি প্রায় পাঁচ বছর (১৮৪৮১৮৫২) বন্দি জীবন যাপন করেন। পরবর্তীতে ১৮৫২ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।





২৭ মুক্তির পর আমীর আব্দুল কাদির ১৮৫২ সালে দামেস্কে বসতি স্থাপন করেন তার আধ্যাত্মিক শিক্ষক ইবন আরাবীর শহর ও বাসস্থানে। সেখানে তিনি শিক্ষাদান ও সামাজিক কাজে নিয়োজিত থাকেন।





২৮ ১৮৬০ সালে দ্রুজ ও খ্রিস্টানদের সংঘর্ষের সময় তিনি নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে হাজার হাজার (প্রায় ১২,০০০ থেকে ১৫,০০) খ্রিস্টানকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেন।

২৯ ১৮. ১৮৮৩ সালে আমীর ইন্তিকাল করেন। তিনি রেখে যান এক কালজয়ী আখ্যান। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন একজন সত্যিকারের মুজাহিদ, দুর্বলদের মুহাফিয।



কেন-১
ইয়াকুব আহমদ

কেন জুমার দিনেই আল্লার ঘরে মানুষের এতো ভিড়?
কেন ফজর-আসর-মাগরিব-ইশায় দিল মরা নামাযীর?
কেন ইমাম সাহেবের ঠিক পিছনে মদখোর সমাজপতি?
কেন ইমামের থাকে নমো-নমো ভাব তাদের প্রতি বেশি?
কেন মিম্বরে বসে কয় না ইমাম সত্যের বাণী কিছু?
কেন প্রভাবশালী নেতার প্রতি ইমামের শির নিচু?
কেন মুয়াযযিনের একটু ভুলেই বলবে লোকে যা-তা?
কেন তিন হাজারেই আটকে থাকে ইমামদ্বয়ের ভাতা?

কেন মীলাদ-কিয়াম দ্বন্দ্ব নিয়ে আলিমেরা দুইভাগে?
কেন এসব ছেড়ে দ্বীনের তরে মিলিত হয় না আগে?
কেন ভণ্ডেরা সব পীর সেজে আজ দ্বীনের ব্যবসা করে?
কেন মুর্খেরা সব আলিম রূপে মুফতীর বেশ ধরে?
কেন ওয়াজের প্রতি নেই কারো নেই বিন্দুসম টান?
কেন শিন্নী বাটার সময় এলেই জনতার ছুটে বাণ?
কেন আমজনতা সুরের পাগল শিল্পী হুযুর চায়?
কেন আমলের বয়ান শুনতে না চায় শেষ বেলাতে যায়?

কেন নবীর বাগান মাদরাসাতে হিন্দুয়ানি পাঠ?
কেন নাচ-গান দিয়ে নাপাক করা বিদ্যালয়ের মাঠ?
কেন উলামার দলে দেয় না গিয়ে নাচ-গানেতে বাধা?
কেন লম্বা নোটের বেতন ফাঁদে আলিমেরা আজ বাঁধা?
কেন প্রাইভেট আর কোচিং নামে ব্যবসা শুরু করা?
কেন প্রাইভেট পড়া ছাত্রই পাশ অন্যরা খায় ধরা?
কেন পর্দাবিহীন ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি সিট করা?
কেন ষোলো বছরের যুবতীর নাই হিজাবটা আজ পরা?

জিহাদের তরবারী
বদরুল ইসলাম

ময়দানেতে রক্তপাত তো শুধুই জিহাদ নয়
ফিতনার যুগে সত্য প্রচার এটাও জিহাদ হয়
সৈনিকেরা সত্য প্রচারে হয় যে কলমধারী
পরওয়ানা শুধু পত্রিকা নয় জিহাদের তরবারী।
দ্বীনের আলোকে যায় মিটিয়ে যুগের চাহিদা
ফিতনার মাঝে পাই যে খুঁজে সঠিক আকীদা
শিক্ষা যে দেয় নৈতিকতা, সত্যের কান্ডারি
পরওয়ানা শুধু পত্রিকা নয় জিহাদের তরবারী।

বর্ণমালার মেয়ে
মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

বর্ণ নিয়ে খেলা করে
পাশের বাড়ির আলো
সকাল সন্ধ্যা পড়তে বসে
পড়ায় খুবই ভালো।

বর্ণমালার মেয়ে বলে
সবাই চেনে তাকে
মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে
পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

ভাব-ভঙ্গিমায় ছড়া পড়ে
শুনতে লাগে ভালো
দিকে দিকে মিষ্টি মেয়ে
ছড়ায় ছড়ার আলো।

গাইতে পারে গানও মধুর
কণ্ঠ তাহার সেই
পাড়ায় পাড়ায় সাড়া জাগায়
কোন জুড়ি নেই।

প্রর্থনা
হালিমা সাদিয়া

আমার অঝোরে কান্না—
চোখের পানির প্রতিটি ফোঁটা
আল্লাহর সাথে কথা বলে

আমার আকুল আবেদন
আর্তনাদ, আহাজারি
প্রতিটি নিঃশ্বাস!
আল্লাহর সাথে কথা বলে

আমার আর্জি, ফরিয়াদ—
অন্তরের চাওয়া-পাওয়া
মাওলার দরবারে অঝোরে কাঁদে!

দিদার সাধনায়
লিমান হোসাইন

এই অধমের আর্জি মাবূদ
নিত্য কামনায়
আশায় আশায় বুক বেঁধেছি
দীদার সাধনায়।

অশ্রুতে মোর গাল ভিজে যায়
কাঁদি দিবারাত
গুনগুনিয়ে গাই যে আমি
রাসূল নামের নাত।

জীবদ্দশায় একটি যে বার
এই অধমের স্বপন
দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে
নবীর নূরী বদন।

কবূল করো দুআ আমার
দাও গো হিদায়াত
রোজ হাশরে নসীবে দাও
নবীর শাফাআত ।

ঝরা পাতার বিষাদ
ইয়াছমিন মাছুমা

ঝরা পাতার মতো ঝরে যায় অনুভূতি
নিঃশব্দ বিকেলের ক্লান্ত হাওয়ায়
কেউ দেখে না তার পতন
শুধু মাটির বুক জানে—
কতটা শব্দহীন ভাঙন
লুকিয়ে থাকে তাতে

একদিন যে অনুভব ছিল সবুজ
রোদে ঝলমলে প্রাণের মতো
আজ সে হলুদ বিষাদে রাঙা
ডালের মায়া ছিঁড়ে—
নেমে আসে অনিবার্য শূন্যতায়

তবু কি সবই শেষ?
না, ঝরে পড়াও এক ধরনের প্রস্তুতি—
নতুন কুঁড়ির জন্য জায়গা করে দেওয়া
মৃত পাতার নিচেই জন্ম নেয়
আবার একদিন সবুজের প্রতিশ্রুতি

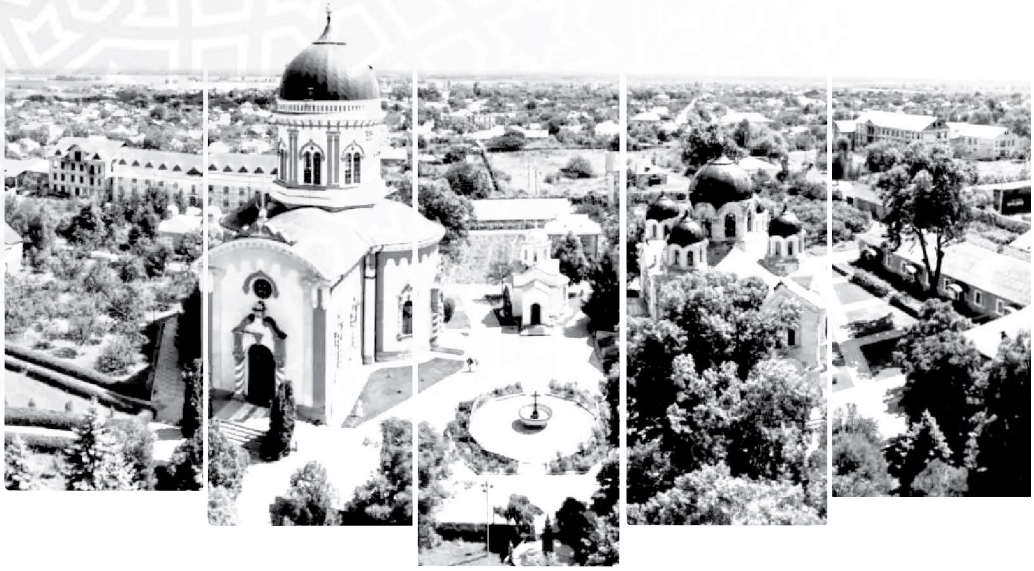

জানার আছে অনেক কিছু

ট্রান্সনিস্ট্রিয়া: দেশ না হয়েও অদ্ভূত এক দেশ

ইউরোপের এক কোণে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় ও অদ্ভুত এক ভূখণ্ড ট্রান্সনিস্ট্রিয়া (Transnistria) কাগজে-কলমে এটি মলদোভা প্রজাতন্ত্রের অংশ হলেও, বাস্তবে এটি নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালনা করে। ট্রান্সনিস্ট্রিয়া সম্পর্কে ১০টি আকর্ষণীয় তথ্য জেনে নেয়া যাক–

* **অস্তিত্বহীন এক দেশ:** ট্রান্সনিস্ট্রিয়া নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করে এবং তাদের নিজস্ব সরকার, সেনাবাহিনী ও মুদ্রা রয়েছে। তবে জাতিসংঘভুক্ত কোনো দেশই আজ পর্যন্ত এর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি।

* **টাইম ট্রাভেলের অনুভূতি:** এই ভূখণ্ডে পা রাখলে মনে হবে আপনি আক্ষরিক অর্থেই সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলে ফিরে গেছেন। এর রাস্তায় রাস্তায় এখনো জ্বলজ্বল করছে লেনিনের বিশাল মূর্তি, কাস্তে-হাতুড়ির প্রতীক এবং সোভিয়েত ধাঁচের নানা স্মৃতিস্তম্ভ।

* **প্লাস্টিকের তৈরি মুদ্রা:** ট্রান্সনিস্ট্রিয়ার নিজস্ব মুদ্রা রয়েছে, যার নাম ট্রান্সনিস্ট্রিয়ান রুবল'। এখানকার সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, তাদের ১, ৩, ৫ এবং ১০ রুবলের মুদ্রাগুলো ধাতুর নয়, বরং বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির প্লাস্টিকের তৈরি!

* **একটি কোম্পানির একচেটিয়া রাজত্ব:** পুরো ট্রান্সনিস্ট্রিয়ার অর্থনীতি ও দৈনন্দিন জীবন 'শেরিফ' (ঝযবৎরভভ) নামের একটিমাত্র সুপার-কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল। এখানকার সুপারমার্কেট, পেট্রোল পাম্প, টিভি চ্যানেল, মোবাইল নেটওয়ার্ক, এমনকি বিখ্যাত ফুটবল ক্লাবটির মালিকও এই শেরিফ কোম্পানি।

* **লম্বা কিন্তু অদ্ভুতভাবে চ্যাপ্টা:** ট্রান্সনিস্ট্রিয়ার আয়তন মাত্র ৪,১৬৩ বর্গ কিলোমিটার হলেও এর আকৃতি খুবই অদ্ভুত। এটি প্রায় ২০০ কিলোমিটার লম্বা কিন্তু গড়ে মাত্র ২০ কিলোমিটার চওড়া একটি সরু উপত্যকা। অর্থাৎ, আপনি যদি দেশটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আড়াআড়িভাবে হাঁটা শুরু করেন, তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই পুরো দেশ পার হয়ে অন্য দেশে ঢুকে যেতে পারবেন!

* **নিরাপদ কিন্তু রহস্যময়:** পর্যটকদের কাছে এটি অত্যন্ত নিরাপদ একটি জায়গা। তবে এখানে পশ্চিমা দেশের কোনো দূতাবাস না থাকায় কোনো আইনি বা কূটনৈতিক সমস্যায় পড়লে বাইরের কোনো দেশের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব।

* **পাসপোর্টের কোনো মূল্য নেই:** ট্রান্সনিস্ট্রিয়ার নাগরিকদের নিজস্ব পাসপোর্ট দেওয়া হয়। তবে আন্তর্জাতিকভাবে এই পাসপোর্টের কোনো স্বীকৃতি নেই। তাই অন্য দেশে ভ্রমণের জন্য এখানকার বাসিন্দাদের মলদোভা, রাশিয়া বা ইউক্রেনের পাসপোর্টের ওপর নির্ভর করতে হয়।

* **অদ্ভুত এক টাইম জোন:** ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে মলদোভার ভেতরে হলেও, ট্রান্সনিস্ট্রিয়া নিজেকে রাশিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মনে করে। এমনকি মলদোভার চেয়ে রাশিয়ার সময় ও সংস্কৃতির সাথে এরা নিজেদের বেশি মেলাতে পছন্দ করে।

* **সবচেয়ে বড় স্ট্যাম্পের বাজার:** যেহেতু এই দেশকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না, তাই আন্তর্জাতিক ডাক যোগাযোগে এদের নিজস্ব স্ট্যাম্পের ব্যবহার সীমিত। তবে অদ্ভুত ও দুর্লভ ডিজাইনের কারণে এখানকার ডাকটিকিট বা স্ট্যাম্পগুলো বিশ্বজুড়ে টিকিট সংগ্রাহকদের (Philatelists) কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

* **কঠোর সীমান্ত নিয়ম:** মলদোভা থেকে ট্রান্সনিস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করতে হলে কঠোর বর্ডার চেকিং পার হতে হয়। পর্যটকদের সাধারণত মাত্র কয়েক ঘণ্টার বা সর্বোচ্চ কয়েক দিনের জন্য বিশেষ ট্রানজিট পাস দেওয়া হয়, যার সময়সীমা পার হলে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আসসালামু আলাইকুম। আমি নিয়মিত পড়াশোনা করি, কিন্তু পত্রিকা পড়ার অভ্যাস এখনো গড়ে ওঠেনি। অনেকে বলে, পত্রিকা পড়লে জ্ঞান বাড়ে, ভাষা সুন্দর হয় এবং সাধারণ জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের বাইরে পড়ার জন্য সময় বের করাও কঠিন মনে হয়। প্রতিদিন কতটুকু সময় পত্রিকা পড়া উচিত? আর পত্রিকা পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়ে তুলতে পারি?

মাহিমা ইসলাম
বুড়িচং, কুমিল্লা

-আন্দালিব ভাই

ওয়ালাইকুমুস সালাম। পত্রিকা হলো জানার মাধ্যম, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম, ভাষা শেখা ও চিন্তার জগৎ প্রসারিত করারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রতিদিন মাত্র ১০-১৫ মিনিট মনোযোগ দিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। নতুন কিছু শিখবে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নোট করবে এবং নিজের মতামত গঠনের চেষ্টা করবে। মনে রেখো, ভালো পাঠকই একদিন ভালো লেখক ও চিন্তাশীল মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তোমার বইয়ের বন্ধুত্ব আরও গভীর হোক।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি মাসিক পরওয়ানার আবাবীল ফৌজ বিভাগের একজন সদস্য। পরওয়ানায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা, প্রতিযোগিতা ও শিক্ষামূলক আয়োজন আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমি জানতে চাই, পরওয়ানার মতো একটি পত্রিকা আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের জীবনে কী ভূমিকা রাখতে পারে?

রেদওয়ান রাফি
ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

মাসিক পরওয়ানা তোমাদের জ্ঞান, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশের একটি সুন্দর সঙ্গী হতে পারে। এর মাধ্যমে তোমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মীয় জ্ঞান, সমসাময়িক বিষয় এবং মনীষীদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে। পাশাপাশি নিজের লেখা প্রকাশ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগও তৈরি হবে। নিজে পড়বে, বন্ধুদের পড়তে উৎসাহিত করবে এবং নিয়মিত পাঠক হওয়ার চেষ্টা করবে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি গল্প, কবিতা ও বিভিন্ন দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক পত্রিকা পড়তে ভালোবাসি। কিন্তু পরীক্ষার সময় পরিবারের সবাই বলেন, পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কিছু পড়া উচিত নয়। ফলে পত্রিকা পড়তে গেলেও মনে হয়, পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। একাডেমিক পড়াশোনা ও পত্রিকা পাঠ দুটো কীভাবে সমানভাবে চালিয়ে যেতে পারি?

হাবিব হাসান হৃদয়
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

পাঠ্যবই তোমাকে পরীক্ষায় ভালো করতে সাহায্য করবে, আর পাঠ্যবইয়ের বাইরের ভালো বই ও পত্রিকা তোমাকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে। তাই একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়; প্রয়োজন দুটির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা। প্রথমে প্রতিদিনের পড়ার রুটিন ঠিক করো। নির্ধারিত একাডেমিক পড়া শেষ করে ২০৩০ মিনিট পত্রিকা পড়তে পারো। পরীক্ষার সময় পত্রিকা পাঠের সময় কমিয়ে আনবে, তবে অভ্যাসটি পুরোপুরি ছেড়ে দেবে না। মনে রেখো, ভালো যেমন ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জ্ঞানী ও দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে ওঠাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

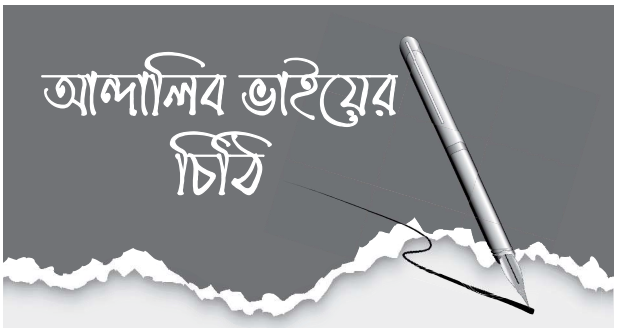

প্রিয় আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

স্নেহ ও ভালোবাসা নিও। তোমরা যারা পড়াশোনার পাশাপাশি জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশে পরওয়ানা সঙ্গে যুক্ত রয়েছ, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রইল শুভকামনা।

মনে রেখো–শিক্ষাজীবন কেবল পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের নাম নয়; বরং নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। নিয়মিত পড়াশোনা, সুন্দর আচরণ, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা তোমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে এগিয়ে রাখবে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পত্রিকা ও ভালো বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। পত্রিকা তোমাদের চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করবে এবং ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ করে 'মাসিক পরওয়ানা' নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে তোমরা কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, মনীষীদের জীবন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। এবং জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে।

বন্ধুরা,

আবাবীল ফৌজ তোমাদের প্রতিভা বিকাশের একটি সুন্দর ক্ষেত্র। এখানে তোমরা লেখালেখি, সাধারণ জ্ঞান, সৃজনশীল কাজ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাবে। তাই নিয়মিত অংশগ্রহণ করবে, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ রাখবে এবং বিজয়ী না হলেও হতাশ হবে না। প্রতিটি অংশগ্রহণই তোমাদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সুযোগ।

তোমরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে, চরিত্রে সুন্দর হবে, আচরণে বিনয়ী হবে এবং দেশ, জাতি ও ইসলামের কল্যাণে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্প। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবার ইলমে, আমলে ও জীবনে বরকত দান করুন। তোমরা আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখো–এই কামনাই করি।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. এ বছর আলিম ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার কত?
২. শাইখ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার দরসগাহ কোথায় অবস্থিত?
৩. অমুসলিমদের পূজা বা ধর্মীয় উৎসব উপভোগ করার বিধান কী?
৪. 'জঙ্গে জামাল' অর্থ কী?
৫. আবদুল কাদির আল জাযাইরীর নিজস্ব মুদ্রার নাম কী?

গত সংখ্যার উত্তর

১. North Atlantic Treaty Organization
২. ৮৫২ হিজরী
৩. ১৯৫২ সালে
৪. আবূ সালিহ মূসা
৫. দান করা

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম দুইজন পুরস্কৃত]

আবু তালহা মো. ছাইম, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # আজিজুর রহমান ছামি, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # এম.টি.আর হিসান, দক্ষিণ সুরমা সরকারি কলেজ # তাছনুবা তাবাসসুম নোহা, কুলাউড়া দারুসসুন্নাহ মডেল দাখিল মাদরাসা # এম. সাহাব উদ্দিন, সদর জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # হাবিব আল হাসান সাকিব, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # নাঈম আহমদ, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল মুনঈম জামী, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মুনতাকা জামান মাহি, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # তাহমিদুর রহমান চৌধুরী, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, জকিগঞ্জ, সিলেট # ইব্রাহিম হক শুভ, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাহেল আহমদ, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদ্রাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # ইহতেশামুল ইসলাম চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # খুবায়েব আহমদ, লালাবাজার ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা।

শব্দকল্প

১	২			৪
৫			৬	
		৭		
	৮		৯	
১০			১১	

সূত্র: পাশাপাশি

১। বাংলাদেশের একটি ঋতু; ৫। চরণ, পা; ৬। চাকরি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ; ৮। কুহেলিকা; ১০। দুঃখ, যন্ত্রণা; ১১। সহধর্মিণী

সূত্র: উপর-নীচ

১। প্রতিজ্ঞা; ২। খারিজ, বাতিল; ৩। কর্ম; ৪। নুন; ৭। শর্বরী; ৮। ভদ্র, মার্জিত; ৯। দিবাকর

গত সংখ্যার শব্দকল্পের সমাধান

প	লা	শী		পা	শা
র			আ	ল্লা	হ
ও	মা	ন			জা
য়া			জা	না	লা
না	জে	হা	ল		ল
	তা	ল		মা	

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
আবূ ফারহান
সানরাইজ স্কুল এণ্ড কলেজ, বরুড়া, কুমিল্লা

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম দুইজন পুরস্কৃত)

সফিউল আলম রিয়াদ, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাহেল আহমদ, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # তাহমিদুর রহমান চৌধুরী, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, জকিগঞ্জ, সিলেট # খন্দকার শামসুদ্দুহা কিবরিয়া, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত, কুলাউড়া দারুস সুন্নাহ মডেল দাখিল মাদ্রাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট।

বর্ণকল্প

জ	ম	আ	ন	হা	য়ো		
রা	পু	যা	ন	ভি	ন		
খ্যা	প	স	ন	রি	ং		
ৎ	ব	ত	উ	ন	স		
বি	ন	অ	তা	ক	মা		

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে শব্দ বানাও। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সমাধান

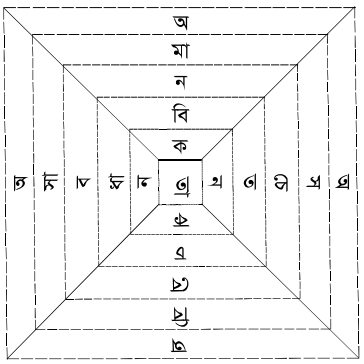

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আব্দুস সাদিক
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

খুবায়েব আহমদ, লালাবাজার ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা # মাহবুবা জান্নাত, কুলাউড়া দারুস সুন্নাহ মডেল দাখিল মাদ্রাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আরিফ বিল্লাহ খান, কুলাউড়া দারুস সুন্নাহ মডেল দাখিল মাদরাসা # তাছনুবা তাবাসসুম নোহা, কুলাউড়া দারুসসুন্নাহ মডেল দাখিল মাদরাসা, সাদেকপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাছুমা আক্তার মাইশা, কুলাউড়া দারুস সুন্নাহ মডেল দাখিল মাদ্রাসা # রাহেল আহমদ, হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

অদ্ভুত পৃথিবী

পানির নিচে ডাকবাক্স



সাধারণত ডাকবাক্স রাস্তার পাশে কিংবা ডাকঘরের সামনে দেখা যায়। কিন্তু জাপানে এমন একটি ডাকবাক্স রয়েছে, যেখানে চিঠি পাঠাতে হলে ডুব দিতে হয় সমুদ্রের গভীরে! ১৯৯৯ সালে স্থানীয় পর্যটনশিল্পের প্রসার এবং এলাকায় আরও বেশি পর্যটক আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে জাপানের ওয়াকায়ামা প্রিফেকচারের সুসামি উপকূলের কাছে উপসাগরের তলদেশে বসানো হয় এই ব্যতিক্রমী ডাকবাক্স। তখন থেকে প্রতিবছর জমা পড়ছে দেড় হাজারেরও বেশি চিঠি। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে তৈরি এই ডাকবাক্স এখন চিঠি পাঠানোর এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ডাকবাক্সটি সমুদ্রের তলদেশে শক্তভাবে স্থাপন করা হয়েছে। জাপান পোস্টও এটিকে চিঠি পাঠানো ও গ্রহণের ডাকবাক্স হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগের ফলে সমুদ্রের নিচে চিঠি পাঠানোর অভিজ্ঞতা নিতে আগ্রহী মানুষের কাছে জায়গাটি বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ডাকবাক্সটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে এর অভিনব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন অনেকে। প্রিয়জনের কাছে মনের কথা পৌঁছে দিতে পোস্টকার্ডের ব্যবহার বহু পুরোনো। তুলনামূলক কম খরচে ছোট্ট একটি বার্তার মাধ্যমে বন্ধু কিংবা বিদেশে থাকা পরিবারের সদস্যদের কাছে স্মরণীয় মুহূর্তের কথা জানানো যায়।

হাসতে জানি

রাতের বেলায় বাসায় চোর ঢুকেছে। বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়লেও তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেটি জেগে আছে তখনো। চোর জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতেই পেছন থেকে ছেলেটি দৌড়ে এসে ফিসফিস করে বলল, আমার বই-খাতা আর স্কুল ব্যাগ নিয়ে না গেলে আমি কিন্তু চিৎকার করে বাবা-মাকে জাগিয়ে দেবো।

১ম ব্যক্তি : ভাই, আপনি কি বিয়ে করেছেন?

২য় ব্যক্তি : হ্যাঁ, করেছি।

১ম ব্যক্তি : কাকে বিয়ে করেছেন?

২য় ব্যক্তি : একটা মেয়েকে।

১ম ব্যক্তি : সবাই তো মেয়েকেই বিয়ে করে!

২য় ব্যক্তি : না, সবাই মেয়েকে বিয়ে করে না। এই তো গত বছর আমার বোন একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে!

সংগ্রহে: মিসবাহ আজাদ
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

আবাবিল ফোজের সদস্য হলো যারা

৩৬৯০. মো. আব্দুর রহমান
পিতা: আবুল বাশার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: নিমবাড়ি
ডাক: বাদৈর বাজার
থানা: কসবা
জেলা: বি-বাড়িয়া

৩৬৯১. আজিজুর রহমান ছামি
পিতা: মো শফিকুর রহমন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহ জালাল রহ. লতিফিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম: নিশ্চিন্ত
ডাক: নিশ্চিন্ত ৩১৬১
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৬৯২. আবু তালহা মোহাম্মদ সাইম
পিতা: মোহাম্মদ আব্দুন নূর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহ জালাল রহ. লতিফিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম: খলাছড়া
ডাক: খলাছড়া
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৬৯৩. নাঈম আহমদ শুভ
পিডা: আব্দুল মান্নান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল রহ. লতিফিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম: ছয় হাড়া
ডাক: দরগাপাশা
থানা: শান্তিগঞ্জ
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৬৯৪. হাকিমুল হাসান সিয়াম
পিতা: আজিজুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া কমপ্লেক্স
গ্রাম: গরেরগাঁও
ডাক: জুড়ী
থানা: জুড়ী
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৬৯৫. শাহ মো. হামিম আহমদ জিদান
পিতা: শাহ লিটন মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া কমপ্লেক্স
গ্রাম: বাউসা
ডাক: হরিদরপুর
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৬৯৬. তাওহীদ হাসান মাহদী
পিতা: মকবুল হোসেন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া কমপ্লেক্স
গ্রাম: নলডরী
ডাক: কর্মধা
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৬৯৭. ইব্রাহিম হক শুভ
পিতা: এনামুল হক
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া কমপ্লেক্স
গ্রাম: আটগ্রাম
ডাক: আটগ্রাম
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৬৯৮. শাহরিয়ার আহমদ সানি
পিতা: জালাল উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া কমপ্লেক্স
গ্রাম: পশ্চিমশিলুয়া
ডাক: শিলুয়া বাজার
থানা: জুড়ী
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৬৯৯. উবায়দুল্লাহ শাহান
পিতা: জামাল উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া কমপ্লেক্স
গ্রাম: কাচার চক
ডাক: গঙ্গাজল
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট



প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتالي داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

কেন্দ্র
প্র কা শ নী

বুখারী শরীফ

০১ থেকে ৩০ পারা

হরকতসহ আপনার পছন্দের
ছোট/বড় সাইজের কপি সংগ্রহ করুন।

مكتبة الحسنة
মাকতাবাতুল হাসানাহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন
০১৩০৩ ২০১০৯৩

বি.দ্র.: হরকতসহ দুই খণ্ডের বুখারী শরীফ সংগ্রহ করুন।

আপনি কি ২০২৬, ২০২৭, ২০২৮ সালের মধ্যে
হজ্জ করতে চান?
মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে
আজই প্রাক নিবন্ধন করুন
ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী
আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী
+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা
Khaja Air Liner
খাজা
Khaja
air Liner
Travel & Tours
হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ
আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস
Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT
Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED
TURKISH AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
Emirates
QATAR AIRWAYS
SINGAPORE AIRLINES
US-BANGLA AIRLINES
REGENT
NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস
সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার
01724 926 329, 01714 486796
www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস
হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল
01724 691 177, 0248 313524
khajaairliner@yahoo.com

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR
জেনারেল শিক্ষা সমন্বিত একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা

- দাওরা বিভাগ
- হিফজ বিভাগ
- নাজারা বিভাগ

ভর্তি চলছে

বিগত বোর্ড পরীক্ষায় বৃত্তি সহ শতভাগ সফলতা

আমাদের বৈশিষ্ট্য
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধান।
- সুন্নাতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা।
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন। (ইনশা আল্লাহ)
- ইয়াকুবিয়া হিফযুল কুরআন বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ।
- ৫ বছরে নাওয়াহ সহ ইবি: ৫ম, দাখিল ৮ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান।
- কুরআন হিফজের পাশাপাশি সম্পূরক সিলেবাস তথা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় পাঠক্রমের অনুসরণ।
- বোর্ড পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনে বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- বেসিক কম্পিউটার শিক্ষা।
- একাধিক ক্লাস টেষ্ট এবং বিষয় ভিত্তিক মডেল টেষ্ট গ্রহণ।
- প্রবাসী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ।
- ছাত্রদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুযোগ সুবিধা।
- সেমিষ্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক সভা, শবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ।

১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু।
১লা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরিক্ষা ও শ্রেণী কার্যক্রম শুরু।
৫ই জানুয়ারী নতুন ছাত্রদের হোস্টেলে আগমন।





যোগাযোগ
মাওলানা এম এ রব, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক/প্রিন্সিপাল
01716-939918, 01612-062235, (অফিস) 01786-128128
দক্ষিণ তাজপুর বাজার, ওসমানীনগর, সিলেট।

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB TDAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৪ লতিফ ট্রাভেলস

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী **আমাদের** যেকোন **শাখায় রেজিস্ট্রেশনের** আজই যোগাযোগ করুন -

এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা)। পূর্ব জিন্দাবাজার। সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

পরওয়ানা
VISION



নিয়মিত ইসলামিক আলোচনা পেতে মাসিক পরওয়ানার
অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।

সিলেটে খুব শিগগিরই

উদ্বোধন

হতে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা

(ইংলিশ ভার্সন)

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণে
আমাদের সাথেই থাকুন

✆ 01711 77 47 47

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে



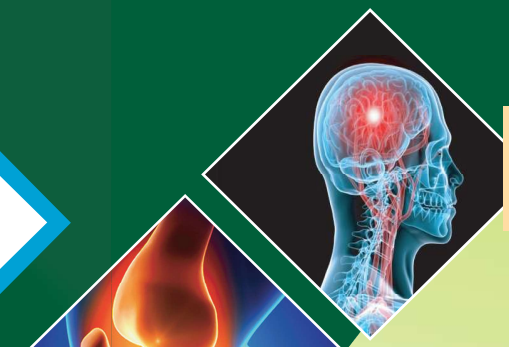





- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল

সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127